নির্জ্জন গ্রহকোণে

এই লেখকের লেখা—

স্বর্গ হইতে বিদায়—১।।০

বিপ্লবী যৌবন—৩৲

যথা পূর্ব্বং—(যন্ত্রস্থ)

নির্জ্জন গৃহকোণে

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

বন্ধুবরেষু—

১লা বৈশাখ, ১৩৪৮

শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়

নির্জ্জন গৃহকোণে

সকাল হয়েছে বটে, রবিরশ্মি কিন্তু এখনও মলিনার ঘরে প্রবেশ করেনি। নদীবক্ষে, বালুকাস্তূপে, পথে প্রান্তরে সর্ব্বত্র সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত। বাগানের গাছের দীর্ঘ ছায়া এসে পড়েছে জানালার সার্সীতে, মলিনার ঘরে তাই আলো নেই।

মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন মধ্য গগনে, তখন সেই ঘরে ক্ষণকাল বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে অজস্র আলো, মেঝের ধূলিকণাগুলি পর্য্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, প্রাচীরের ওপর থেকে টবের গাছগুলির ছায়া ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়।

কিন্তু কতক্ষণ, ঘূর্ণ্যমানা পৃথিবী, সূর্য্য সরে যায়, দেয়ালে মেঘের ছায়া ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। লাল, নীল, ধূসর কত বিচিত্র ছায়া।

গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনে আকাশ আর মেঘ যখন পাথরের মত কঠিন, আলোর ঔজ্জ্বল্য রূঢ় রুক্ষ হয়ে ওঠে, এ হোল সে দিনের প্রাকৃতিক ইতিহাস।

মেঘাচ্ছন্ন দিনে আকাশ নেমে আসে নীচে—আরও নীচে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সূর্য্যাস্তের কোনও রূপ নেই, বৈচিত্র্য নেই, গতি নেই, মেঘভারাক্রান্ত আকাশে সবই সমান। অন্ধকার বেড়ে চলে। দেয়ালের ছবি ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে। সার্সী সারাদিন বন্ধ—বাইরের জোলো হাওয়া ঘরে না আসে, দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন প্রদোষান্ধকার সারাদিনকে গ্রাস করেছে।

উজ্জ্বল আর ম্লান—আকাশ নদী বা দিনের এই প্রাকৃতিক ইতিহাসই মলিনার জীবনের সবচেয়ে বড় কথা, মলিনার অস্তিত্ব যেন আবহাওয়ার সংবাদে দাঁড়িয়েছে। টেম্পারেচার-চার্ট জীবনের একমাত্র পরিবর্ত্তনশীল বৈচিত্র্য।

স্বল্পপরিসর ঘরের এক প্রান্তে মলিনার রোগশয্যা বিছানো, সেখান থেকে জানলা ও দরজা লক্ষ্য করা সহজ। বিছানার উপর সাদা চীনেমাটির বুদ্ধমূর্ত্তি পড়ে রয়েছে, অসুখের সূচনায় শৈলপতি একদিন এটা কিনে এনেছিল। প্রথম প্রথম বাগান থেকে দুচার রকম ফুল তুলে এনে শৈলপতি মলিনার মাথার দিকের টিপয়ে সাজিয়ে রাখ্‌ত, ইদানিং আর সময় হয় না, মাস খানেক আগেকার ফুল ফুলদানিতে শুখিয়ে আছে। সেই টিপয়ের ওপরই এখন জমেছে ওষুধের ছোট বড় নানা রকম শিশি, থার্ম্মোমিটার আর টাইমপীস। মলিনা দিনে অন্ততঃ পনের ষোল বার টেম্পারেচার দেখে, তবু তো একটা কাজ, জ্বর বাড়লে বা কমলেও সে খুসী, সেও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টাইমপীসটা শৈলপতি সম্প্রতি কিনেছে, সাধারণ টাইমপিস নয়, নতুনত্ব আছে, পিয়ানোর সুরে ঘড়িটা বাজে। আর আছে একটা হাত আরশী, মুখ দেখে দেখে নিজের মুখের সরল, বক্র, কুঞ্চিত রেখাগুলি মলিনার মুখস্থ হয়ে গেছে।

নাম তার মলিনা হলেও বর্ণ তার একদা উজ্জ্বল ছিল, সে হিসাবে তার নাম হওয়া উচিত ছিল সুবর্ণা, কিন্তু ইদানিং অসুখের জন্য মলিনার চেহারা শুধু ম্লান নয়, পাণ্ডুর বিশীর্ণ হয়ে পড়েছে।

এখানকার বড ডাক্তার শশিশেখরবাবু, অন্য কোথাও প্র্যাক্‌টিস করলে হয়তো আরও নাম হোত, কিন্তু এদেশ তাঁর ভাল লাগে তাই

এখানেই সারা জীবনটা কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে তিনি প্রতিদিন মলিনাকে দেখে যান, তার উপস্থিতিতে মলিনা পরম প্রশান্তি অনুভব করে, এই শান্তি শুধু মর্ফিয়াতেই সম্ভব। সহসা সে ফিরে পায় জীবনের চাঞ্চল্য, মলিনার অন্তর আনন্দে পক্ষ প্রসারিত করে চেতনাময় যৌবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

গতানুগতিকভাবে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু মলিনার শয্যাপার্শ্বে বসেন, তারপর গম্ভীরভাবে হাত দেখে নাড়ীর গতি অনুভব ক'রে কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করেন, রাতে ঘুম হয়েছিল? তারপর সেই ব্যথাটা একটু কম ছিল ত? এর পর মলিনার উত্তরের ওপর নির্ভর করে ডাক্তারবাবুর দুটি বাঁধা কথা 'বেশ' কিংবা 'হুঁ', প্রতিদিন একই কথার পুনরাবৃত্তি, কিন্তু সর্ব্বদাই নূতন শক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মলিনা।

এ সময়টায় শৈলপতি নিয়মিতভাবে ঘরে উপস্থিত থাকে, জানলার ধারে দাঁড়িয়ে উদাসভাবে সিগ্রেটের কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়ার অন্তরালে নিজের বিচ্ছিন্ন চিন্তাসূত্রের সন্ধান করে, কখনও আবার মলিনার বিছানায় কাছে এসে অসংলগ্ন দুটো একটা কথা কিংবা রসরহস্য করে, হেসে ওঠে, কখনও বা ছোটখাট জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। শৈল-পতির এ একটা কাজ। মলিনা কিন্তু ঠিক এ সময়ে তার উপস্থিতিতে আনন্দিত হোত না, মাথার কাছে যেন গুঞ্জনরত মক্ষিকার ভীতিজনক উপস্থিতি। এই অতি-ব্যস্ততার ভাণ তাকে আহত করে।

মেয়েদের মত ক্ষিপ্রতায় শৈলপতি নিজের হাতে সব গুছিয়ে তবে বেরোত, সব কাজ সে এমন সহজভাবে করতো যে মলিনা সময় সময় বিস্মিত হয়ে পড়তো, শৈলপতির কোনো কাজেই ও লাগছে না, এর

জন্য মনে মনে মলিনার অনুশোচনার আর সীমা নেই। দশ বছর ওদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু এ দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের মধ্যেও শৈলপতির আবির্ভাব মলিনার কাছে প্রথম দিনের মতো নিবিড় অনুভূতির সৃষ্টি করে, শৈলপতির আশঙ্কাকরুণ স্নিগ্ধ স্পর্শের সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে মলিনা আনন্দময় উদ্দেশ্যহীনতায়। সুদীর্ঘ অন্তরঙ্গতার পরও শৈলপতির ক্ষিপ্র এবং তীক্ষ্ণ দেহবঙ্কিমার দিকে বুভুক্ষিতের মতো চেয়ে থাকে মলিনা, সারা দেহমনে কি সুতীব্র অনুভূতি!

মৃত সন্তানের মুখে দুগ্ধভারাবনত পীবর স্তন দিয়ে মলিনা একদিন হৃদয়ে যে বেদনা অনুভব করেছিল, আজও মাঝে মাঝে সেই বেদনা ওকে বিহ্বল করে তোলে, শরীরের যা কিছু শ্রেষ্ঠ সম্পদ সব আজ ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে।

বুকের ব্যথা একটু কম পড়লেই মলিনা মনে করে এইবার সে সেরে উঠবে, আর কষ্ট পাবে না, কিন্তু কতক্ষণ! অখণ্ড স্তব্ধতার মাঝে নির্জ্জন গৃহের এই নিরালা কোণে শুয়ে মলিনা বুকের চারপাশে রুগ্ন আঙুলগুলি সঞ্চারিত করে একটু শান্ত হতে চায়, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার ব্যথায় যন্ত্রনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। যন্ত্রনার বিভীষিকায় ছিন্ন হয়ে যায় মলিনার অন্তর—সারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অকস্মাৎ বন্ধনমুক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। মলিনা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নড়বার শক্তি নেই। ক্রমশঃ রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মতো মলিনার বেদনার প্রকোপ কমে আসে, মলিনা ভাবে, একাকী এই ঘরের নির্জ্জন কোণে এইবার হয়ত সে মরে যাবে, দেয়ালে জ্বলবে প্রখর সূর্য্যালোক, নদীতে বইবে উচ্ছল জোয়ার। যদি সে মরতে পারতো, অন্ততঃ সে এই যন্ত্রণা ও বিভীষিকার হাত থেকে মুক্তি পেত। আর কতদিন!

ব্যথা ক্রমশঃ কমে যায়, নিষ্প্রাণ শক্তিহীন দেহ নিয়ে মলিনা চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবে, একটা নার্স থাকলে হয়ত ভালো হোত, আজ শৈলপতি এলে বলবে।

সন্ধ্যার পর শৈলপতি ফিরল, উচ্ছ্বসিত উৎসাহে সারা বাড়ি সচকিত করে তোলে—চীৎকার করে ওঠে—কেমন আছো গো রাণী! আজ যা আঙুর পেয়েছি ফাষ্টক্লাস।

মলিনার জীবনে যেন সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয় হ'ল, সব ভুলে গেল মলিনা, যন্ত্রণার কথা, রোগের কথা, নার্সের কথা। শৈলপতি মলিনার রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, আর মলিনা ক্ষীণকণ্ঠে বল্লে —কত কষ্টই না তোমায় দিচ্ছি!

—কষ্ট কি রাণী! তুমি সেরে উঠলেই আমার সুখ। তুমি চুপ করে শোও, একজন বন্ধু এসেছেন, একটু চা-টা করে দিই।

স্তিমিত হয়ে আসে মলিনা। পাশের ঘরের কলহাস্য, কথার ভগ্নাংশ মলিনার কানে ভেসে আসে, কত অবান্তর অসংলগ্ন কথা, ম্যালেরিয়া থেকে মহাযুদ্ধ, কি উত্তেজনা! কিন্তু রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্য্যায় যার দিন কাটে তার জীবনে উত্তেজনার উৎসাহ কোথায়, কোথায় পাবে সে অফুরান্ত আয়ু, চেতনাময় যৌবন!

সেদিন সকালে যখন শশিশেখরবাবু এলেন, শৈলপতি তখন কোথায় যেন বেরিয়েছে, সেই অবসরে মলিনা ডাক্তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, সেরে ত উঠলাম না; মৃত্যু কবে হবে বলতে পারেন?

ডাক্তারবাবু হেসে বল্লেন—আমি ত মা ভগবান নই, মৃত্যুর কথা কি করে বলি বল?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে মলিনা বল্লে—মানে আর কত দেরী ?

স্নিগ্ধ সংযত কণ্ঠে ডাক্তারবাবু বল্লেন—মরণের কথা কেউ কি বলতে পারে, যে কোনো মুহূর্ত্তে তা ঘটতে পারে, কিন্তু অত ব্যস্ত হলে কি চলে না ?

মলিনা আর কথা কয় না।

তারপর কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্ত, বারান্দায় যেন মৃত্যুর পদধ্বনি শোনা যায়। শশিশেখরবাবু আবার কথা সুরু করেন, তোমার নার্স রাখার আপত্তিটা ছাড়তে হবে আমি কদিন ধরেই বলছি, এ ভাবে একা একা থাকা ঠিক নয়।

বিস্মিত হোল মলিনা, বললে,—আমার রাজী হওয়া মানে ?

—শৈলবাবু বলছিলেন কি না। তারপর মলিনার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তা হলে তোমার কি আপত্তি নেই মা ?

—আপত্তি ! মানে, হ্যাঁ আপত্তি—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে ? তবে যদি দরকার বিবেচনা করেন, তাহলে অবশ্য রাখতেই হবে।

—বেশ আমি আজই ব্যবস্থা করছি, ভাল লোক আছে, আমার জানা লোক।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন, মলিনা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, শৈলপতি নার্স সম্বন্ধে এ কথা বলেছে কেন ? ওর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করলে ও চটে যায়, কিন্তু মলিনাকে সে সত্যি ভালবাসে, মলিনার অসুখের ব্যাপারে ওর দুশ্চিন্তার আর সীমা নেই।

সেদিনই এক পাত্‌লা রঙীন চাদর কিনে আনলে শৈলপতি, মলিনার গায়ে ঢাকা দিয়ে বললে, ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু, ঠিক যেন বিয়ের দিনের মতো।

কি-ই বা বলবে মলিনা, তবু কিছুক্ষণ পরে ভয়ে ভয়ে বললে, ডাক্তারবাবু বলছিলেন একজন নার্স রাখা দরকার, আজই পাঠিয়ে দেবেন।

একটু চুপ করে থেকে শৈলপতি বললে, বেশ ত। তারপর অনাবশ্যক হাসি হেসে বললে, আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলুম, ভয় ছিল পাছে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলার সঙ্গ অপছন্দ কর তাই কিছু বলি নি।

পাঁচটার পর নার্স এলো, সুশ্রী, পরিচ্ছন্ন এবং তরুণী। তার নাম জগৎমোহিনী নয় জয়ন্তী। রীতিমত আধুনিক এবং শিক্ষিতা নার্স। নার্সের আগমনে মলিনা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল, রোগের বোঝা এইবার অপরের ঘাড়ে নামিয়ে সে একটু বিশ্রাম করতে পারবে। শৈলপতির সেবা যত্নের পেছনে মলিনার কুণ্ঠামিশ্রিত তৃপ্তি বর্ত্তমান।

এবার সে উপভোগ করবে অকুণ্ঠিত তৃপ্তি। মলিনার চারপাশে নিয়তই দুশ্চিন্তার জাল প্রসারিত, এই নির্জ্জন গৃহকোণের নিঃসঙ্গ পরিবেশ মলিনার কাছে রোগশয্যার চেয়েও ক্লান্তিকর, ব্যথার চেয়েও দুর্ব্বিসহ হয়ে উঠেছে।

একদিন দুপুরে সদর-দরজায় কড়া নেড়ে উঠেছিল, সেই সময় ব্যথাটা বেড়েছে, যন্ত্রণায় মলিনা ছটফট করছে, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা গেল, মলিনার ইচ্ছা হোল একবার উঠে দেখে, কিন্তু তার নড়বার শক্তি নেই, চীৎকার করবার সামর্থ্য নেই। মলিনার

মনে হোল, তার বেদনা উপশম করবার জন্যে দোর ভেঙে পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে আসছে। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে এমন সব সম্ভব অসম্ভব কথা মনে পড়তে লাগল যার কোনো মানে নেই, একবার মনে হোল হয়ত শৈলপতি আহত হয়েছে মোটর-দুর্ঘটনায়, ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে এসেছে বুঝি তার আহত দেহ! বিপদ ঘটতে কতক্ষণ, এমন তো কত হয়! তারপর, অবশেষে কড়া নাড়ার আওয়াজ থামলো, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। অজ্ঞাত রহস্যে ডুবে রইল মলিনা, কে যে কড়া নাড়লে, তা আর কোন দিন জানা গেল না।

নার্সের আগমনে মলিনা তাই সুস্থ বোধ করেছে, বুকের ব্যথাটা একটু কম পড়েছে যেন, বারে কমেছে। মলিনার আর ভয় করে না। জয়ন্তী বই পড়ে, খবরের কাগজ পড়ে শোনায়, গল্প বলে, মাঝে মাঝে আবার মৃদুকণ্ঠে গান গায়। মলিনাকে ভুলিয়ে রাখে জয়ন্তী—নার্স ও সখীর সমন্বয়। মলিনার নির্জ্জনতার কষ্ট, নিঃসঙ্গের দুঃখের অবসান হয়েছে। সূর্য্যদেবের গতিপ্রকৃতি, নদীর উচ্ছল স্রোতের হিসাব-নিকাশ আর সে তেমন রাখে না। মানুষ ও সমাজের কথা শুন্‌তে মলিনার আবার ভাল লাগে।

মলিনা আবার নতুনভাবে জীবন সুরু করেছে, ভুলে যেতে চায় এই কয়মাসের গ্লানিকর জীবনের ইতিহাস!

নার্সকে মলিনা জয়ন্তী বলেই ডাকে, শৈলপতি কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মিস্ সেনের নীচে নামতে পারেনি, তার এই অর্থহীন ভদ্রতা মলিনার ভাল লাগে না। মলিনা চায় জয়ন্তীকে আত্মীয়ের মতো করে টেনে নিতে, তার করুণায় সে পুনর্জ্জীবন লাভ করেছে। জয়ন্তীর সংস্পর্শে এসে আজ মলিনার বাঁচতে ইচ্ছা করে, তাড়াতাড়ি সেরে

ওঠবার তার অসীম আগ্রহ। জীবনের যা কিছু রমণীয়, বিছানায় শুয়ে আঙুলের ফাঁকে তা আর গলে যেতে দেবে না মলিনা। শৈলপতির সর্ব্বব্যাপিত্ব ও প্রাধান্য যেন ইদানীং কমে এসেছে, সে আর এখন মলিনার রুগ্ন জীবনের অনিবার্য্য প্রয়োজন নয়, কিন্তু জয়ন্তীর প্রয়োজনীয়তা এখন অপরিহার্য্য।

মলিনা দেখাতে চায় সে যেন সেরে উঠেছে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ফিরে আসে ব্যথার প্রকোপ। এবারকার আক্রমণ আরো গভীর—আরো ব্যাপক, ফলে মর্ফিয়া দুদিন মলিনাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে, এর পর মলিনা আরো ক্ষীণ হয়ে পড়লো। সেরে উঠবার বাসনা ভেঙে গেল, জয়ন্তীকেও আর সব সময় ভাল লাগে না, সেই সময় মলিনার মনে হয়, আর এ জীবনে কি প্রয়োজন, বেঁচে থাকার কোনো মানে নাই।

ক্রমশঃ এ ভাবও কাটলো, আবার জয়ন্তীর কাছে মলিনা শোনে হাসপাতালের গল্প, ডাক্তারের কাহিনী, মেট্রনের মেজাজ, আরো কত কি—মলিনা অবাক হয়ে যায়। ডাক্তার আর নার্স, মলিনার কাছে এদের আসন অনেক উঁচুতে, কিন্তু জয়ন্তীর গল্পে অনেক রহস্যের যবনিকা উঠলো।

শৈলপতির মনে আর তেমন আনন্দ নেই, জয়ন্তী ঘরে থাকলে সে মলিনার কাছে আসতে কুন্ঠিত হয়, মলিনা মনে মনে ভাবে—ঈর্ষা, শৈলপতি এলে তাই জয়ন্তীকে ইসারা করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। তারপর শৈলপতি মলিনার লিকলিকে সরু হাতখানা তুলে নিয়ে আদর করে, দুটো মিষ্টি কথা বলে—আশার কথা, সান্ত্বনার কথা। মলিনা শীগগির সেরে উঠবে।

কিন্তু এও বাঁধা ফর্ম্মুলা, মলিনা যে সেরে উঠবে সে বিশ্বাস তার নেই।

আজকাল শৈলপতির জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাওয়া যায়। গলার আওয়াজ ভারী, প্রকৃতি গম্ভীর হয়ে ওঠে। একবার ফিরে আসে—আবার কোথায় বেরিয়ে যায়, কপালের কুঞ্চিত রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মলিনা সবই বোঝে। বাক্যের অসংযম, ব্যবহারে দীপ্তির অভাব—সবই তার চোখে ধরা পড়ে। তবু সে নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে চুপ করে থাকে।

মলিনার বিরক্তি বেড়ে যায়, জয়ন্তীকে কি শৈলপতি মলিনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায়। শৈলপতির স্বার্থপরতায় মলিনা যতই উত্তেজিত হয়—ততই তার জয়ন্তীর ওপর নির্ভরতা বেড়ে চলে।

আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মলিনার মনে হয়, জয়ন্তী যেন স্বর্গের দেবী, মলিনাকে সুস্থ করবে বলে নেমে আসছে স্বর্গ থেকে, মাথার চার পাশে বিকিরিত স্বর্গীয় জ্যোতির্বন্যা, হাতে অমৃতভাণ্ড, কৃতাঞ্জলিবদ্ধ মলিনা সবিনয়ে অমৃত প্রার্থনা করছে, কিন্তু অদৃশ্য লূতাতন্তুর বাধা অতিক্রম করে কিছুতেই আর জয়ন্তী কাছে পৌছতে পারছে না, শৈলপতিই সেই অদৃশ্য সূত্রের এক প্রান্ত ধরে আছে, বিশ্রী চীৎকার করে গাত্রবস্ত্রের ঘনতর সংস্পর্শের কৃত্রিম অন্ধকারে মুখ ঢাকলে মলিনা। জয়ন্তী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো, কিন্তু সেই যে মলিনার ঘুম ভাঙলো, কিছুতেই আর ঘুম আসে না, অবশেষে জয়ন্তীকে ঘুমের ওষুধ দিতে হ'ল।

শৈলপতির সেদিন শহরে যাবার কথা, ঘুম ভেঙে মলিনা কিন্তু পাশের ঘরে টুকরো টুক্‌রো কথা শুন্‌তে পেলে, কলহাস্যের উচ্ছ্বাসে কথা মাঝে মাঝে চাপা পড়ে যাচ্ছে। তখনও ঘুমের ঘোর ভাল করে কাটেনি, তবুও ঘুম ছাড়িয়ে কথা কানে ছড়িয়ে পড়ছে। মলিনার দক্ষিণের জানলা দিয়ে নদী দেখতে পাওয়া যায়, নিস্তরঙ্গ শান্ত নদীর দিকে চেয়ে নিস্পন্দ মলিনা ক্ষণকাল চুপ করে পড়ে রইল, কান রইলো পাশের ঘরের নরনারীর গুঞ্জনে। কোনো কথাই স্পষ্ট বোঝা যায়না, তবু পুরুষের কণ্ঠ পরিচিত, শৈলপতির চিরপরিচিত হাসি মলিনার ভোলবার কথা নয়। হাস্যরত শৈলপতির মুখখানি মলিনার স্পষ্ট মনে পড়লো।

প্রকম্পিত হ'ল পৃথিবী, এক মুহূর্ত্তে সব শেষ হ'ল, মূর্ত্তি গেল ভেঙে, সুর হ'ল ম্লান। যে দুজনকে ও বিশ্বাস করে, যাদের ওপর একান্ত অসহায়ের মতো নির্ভর করে আছে মলিনা, তারাই ওকে চূর্ণ বিচূর্ণ করল্‌। ভীত, চকিত মলিনা উত্তেজনায় উঠে বসলো। রুগ্নকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে উঠলো,—জয়ন্তী, জয়ন্তী, নার্স!

রাজ্যহারা অনাথার আকুল আর্ত্তনাদ।

ছুটে এলো জয়ন্তী, একি আপনি উঠেছেন কেন দিদি? সে কথার উত্তর না দিয়ে যেন বিকারের ঘোরে মলিনা চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলে, কে কথা কইছে, ওঘরে ওরা কারা?

—ও, ওঘরে, ইলেকট্রিকের মিটার দেখতে এসেছিল, চলে গেছে, এই ব'লে জয়ন্তী দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দিলে। এই দরজার সামনে দিয়েই বাইরে যাবার রাস্তা।

মলিনা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বল্লে—খুলে দাও শীগগির, খুলে দাও দরজা।

পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল, একটু হেসে জয়ন্তী দরজা খুলে দিলে। লোকটি ইতিমধ্যে চলে গেছে।

বিছানা থেকে উঠতে গেল মলিনা, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বুকের ব্যথাটা আবার বেড়ে উঠলো, সেই যন্ত্রণার মধ্যেই মলিনা সদর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনতে পেলে।

জয়ন্তী মলিনার কাছে দৌড়ে এলো, মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে। বুকে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লে, এখুনি কমে যাবে, সেরে যাবে, ভয় নেই দিদি, আপনি একটু চুপ করে শুয়ে থাকুন।

মলিনা জানে, এ ব্যথা আর সারবে না, বেলা শেষ হ'ল, এবার ভাঙার পালা। যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে মলিনা, অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জয়ন্তীর মুখের দিকে, এ ব্যথার অংশ নিক জয়ন্তী, তবু মনে মনে সে আর তাকে বিশ্বাস করে না। জয়ন্তী যেন আর সে জয়ন্তী নয়। সতর্ক হয়েছে বটে জয়ন্তী, তবু তার সারা অঙ্গে পুরুষ সংস্পর্শের মদির উত্তেজনা বর্ত্তমান—নারীর চোখে নারীদেহের এই বিচিত্র রহস্য নগ্ন ও স্পষ্ট হয়ে উদ্ঘাটিত হোল। তীব্র ও তীক্ষ্ণ ব্যথায় মলিনা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্ল।

কিন্তু মলিনার ব্যথা কমলে দেখা গেল, জয়ন্তী ফুলে ফুলে কাঁদছে। জয়ন্তী বল্লে, অনেকের সেবা করেছি, কর্ত্তব্য বলেই করেছি, কিন্তু আপনার কষ্ট আর দেখতে পারি না, আপনি সেরে উঠুন দিদি।

খাটের পাশে বসে মাথাটা বিছানায় এলিয়ে দিয়েছে জয়ন্তী গভীরতম বেদনায়, বিশীর্ণ আঙুল দিয়ে মলিনা সস্নেহে তার মাথার অবিন্যস্ত

চুলগুলি ঠিক করে দেয়। এ সংসারকে ভালবাসবার ক্ষমতা আজো মলিনার বর্ত্তমান, এই আনন্দেই সে আত্মহারা হয়ে রইল।

বিছানার চাদরে মুখ ঢেকে জয়ন্তী পড়েছিল, মলিনার আঙুলের শান্ত স্পর্শে জয়ন্তীর মনোভার নেমে গেল। যেন জননীর অভয়স্পর্শে নিভৃত নীড়ে সন্তান আশ্রয় নিয়েছে।

মলিনা বল্লে, তোমার কাছে যা পেয়েছি তা আমি ভুলতে বসে-ছিলুম। এর পর মলিনাও কেঁদে ভেঙে পড়ে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে জীবনের গতি-প্রাবল্যের ঝড়, রঙ ও লাস্য সব সে হারিয়েছে, দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছে শরতের সোনালি রোদ, জানালার সার্সীতে আছাড় খায় নদীর ঢেউ, বর্ষার বৃষ্টিধারা। আর এই নির্জ্জন গৃহকোণে রোগ শয্যায় শুয়ে আছে রোগজীর্ণা মূর্ত্তিমতী অশান্তি, মৃত্যুর নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনবার আকুল আশায় পড়ে রয়েছে মলিনা।

যথারীতি পরদিন সকালে শশিশেখরবাবু এলেন, সেদিন মলিনাকে দেখে খুসি হলেন। এতদিনে তবু একটু আশা হ'ল। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর মলিনা ঘুমিয়ে পড়লো—গভীর ঘুম। দুতিন ঘণ্টা পরে ঘুম যখন ভাঙলো, তখন দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকালে পৌঁছেছে। শান্ত হয়ে শুয়ে রইল মলিনা, নদীর গতিবিভঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগল। উপরে অশান্ত ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস, অথচ অন্তরে নিবিড় প্রশান্তি। জয়ন্তী বলে—সেরে উঠুন দিদি, সেরে উঠতে কার না সাধ! । মাটির ভিতর থেকে উদ্ভিদের উদ্ভব, তারপর একদা সেই নীলবৃন্তের কুঁড়িতে ফুল

ফোটে—সেই তার সার্থকতা, নদীর জল তট-ভূমিতে আছাড় খেয়ে আহত আনন্দে অভিভূত হয়—সেই তার সার্থকতা। /

সাগরতরঙ্গের উদ্দাম উচ্ছ্বাস অন্তরে অনুভব করলে মলিনা। সেই মুহূর্ত্তেই মনে হলে যেন তার নিশ্বাস আটকে আসছে। আতঙ্কে শিউরে উঠলো মলিনা। জয়ন্তী, জয়ন্তী!

কোনো সাড়া নেই, রুদ্ধ ঘরের বাইরে পৌঁছলো না সে আওয়াজ; প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, জয়ন্তী, জয়ন্তী!

আর একটু অপেক্ষা করলে মলিনা, কোনই সাড়া নেই। হয়ত জয়ন্তী কলঘরে আছে। খাট ধরে আস্তে আস্তে মেঝেয় নেমে এলো মলিনা, তারপর দেয়াল ধরে ধরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

ছ' মাসের মধ্যে এই প্রথম ঘর ছেড়ে বেরুলো মলিনা।

জয়ন্তী! রুগ্ন কণ্ঠে জোর নেই, অবসন্ন হয়ে মলিনা আবার ডাকলে, জয়ন্তী!

মৃত দেয়ালের গায়ে আহত হয়ে ধ্বনি ফিরে এলো। রান্নাঘরে, দালানে, কলঘরে কোথাও জয়ন্তী নেই, কেউ নেই।

মলিনার পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। মলিনা শেষবার ডাকলে জয়ন্তী! অসীম শূন্যে মিলিয়ে গেল ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। শুধু দুরন্ত নদীর জল-কল্লোল সেই নির্জ্জন গৃহকোণে ভেসে এলো।

প্রবল হয়ে উঠলো বুকের ব্যথা, সজোরে দুর্ব্বল আঙুল দিয়ে বুকটা চেপে ধরলে মলিনা, এখনই ঘরে ফিরতে হবে, কিন্তু এটুকু পথ ফিরে যাবার ক্ষমতা তার আর নেই, কান্নায় মলিনার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো

অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে লাগল মলিনা। কুঁড়িতেই শুখিয়ে গেল ফুল, পাপড়ি ঝরে গেল, ফোটার অবসর নেই।

বিছানার ধারে মলিনা পৌঁছতে পারলে না, দক্ষিণের জানলার ধারে ক্ষীণ মুঠোতে চেয়ারটা ধরে মলিনা বসে পড়লো, ব্যথায় যন্ত্রণায় সারা দেহ তার এখনই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

মলিনার চোখে আর জল নেই, ব্যথার যন্ত্রণায় কাঁদবারও তার শক্তি নেই, আতঙ্কের স্নায়ুকেন্দ্র থেকে ব্যথার দুঃসংবাদ প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দেহের স্নায়ু-শিরায় সংঘর্ষ সুরু করেছে। অসহ্য বেদনায় শতধা বিভক্ত হয়ে পড়লে মলিনার রোগজীর্ণ দেহ। বাইরে গর্জ্জন করছে বর্ষা-বিস্ফারিত নদী। কোনো সংযোগ নেই ওদের মলিনার জীবনের সঙ্গে, তবু যেন ওরা একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছে।

এতক্ষণে সদর দরজা খোলার আওয়াজ হ'ল, জয়ন্তী ফিরলো তাহলে, পরম নির্ভরতায় সাময়িকভাবে বেদনার তীব্রতা কমলো। অর্দ্ধ-অচেতন মলিনা নিস্পন্দের মতো পড়ে আছে।

পায়ের ধ্বনি ক্রমশঃই এগিয়ে এল,—রাণী কি খবর ?

জয়ন্তী নয় শৈলপতি ফিরলো। মুখে কথা বেরোল না, নড়বার ক্ষমতা নেই মলিনার।

শৈলপতি ঘরে ঢুকে দেখলে—চেয়ার ধরে মেঝেয় পড়ে আছে মলিনা, তার ধূসর রুক্ষ চুলগুলি পিছনে ভেঙে পড়েছে, লুটিয়ে পড়েছে তার বিস্রস্ত কাপড় আর দেহ, রক্তহীন পাংশু মুখে তীব্র ব্যথা ও অসহ্য

বেদনার চিহ্ন বর্ত্তমান। মৃত্যুর ভয়ঙ্করতা অবশেষে সেই নির্জ্জন গৃহ কোণে এনেছে পরম প্রশান্তি।

জীবন ও মৃত্যুর প্রান্তসীমায় এসে আত্মাকে অবিনশ্বর করার ব্যাকুল অনুপ্রাণনায় মলিনা মাথা খুঁড়ে মরেছে, ইচ্ছা শক্তি ও সামর্থ্য তার প্রাণহীন দেহ থেকে নির্গত হয়ে নিরাকার সান্ধ্য বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ধূসর অন্ধকারের নিবিড় ছায়ায় হারিয়ে গেছে মলিনা—শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণশক্তি মুক্তি পেয়েছে। আজ আর শৈলপতির নয়, মৃত্যুর স্পর্শের সমুদ্রে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে মলিনা।

ভাই-বোন

বিপুল শরীর শূন্যে নিক্ষেপ করে ভবতারণ চীৎকার করে উঠ্লেন, ছিঃ ছিঃ, সুরুয়ায় কি ভয়ানক মুন দিয়েছো, অ' সুরবালা, তোমাদের কি আক্কেল-বিবেচনা সব লোপ পেয়েছে ? সারা দেহ চাদরে আবৃত করে শুধু মুখখানি বার করে তীক্ষ্ণ তিক্ত কণ্ঠে ভবতারণ আবার বল্তে লাগ্লেন, মুন খেলে ব্লাড্ প্রেসার বাড়ে, ডাক্তার যে পই-পই করে বলে দিয়েছে। তারপর চাদরটা গা থেকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলে, হট্ ওয়াটার ব্যাগ, বালিশগুলো সব মেঝেতে ফেলে দিয়ে ভবতারণ অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বল্লেন—আমি মরি তাই চাও, না সুরবালা! ভবতারণের চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

সহিষ্ণুকণ্ঠে সুরবালা বলে উঠল—ওকি কথা দাদা, সব গিয়ে তুমিই যে আমার সব! কোনো কথা কি তোমার মুখে আটকায় না।

ভবতারণ বল্লেন—থাক্‌বে না কেন, ঢের আছে, কেন পুলিন ? কথা কটি অল্প বটে তবু তা সুরবালার অন্তরের মর্ম্মস্থলে তীব্রভাবে আঘাত করলো! ভবতারণের অর্থস্থচক দৃষ্টি সুরবালাকে পীড়িত করে। পুলিন সুরবালার স্বামীর নাম। সুরবালা শান্তকণ্ঠে বল্লে—হঁ্যা, ভাই-বোনের মধ্যে তুমি, আর উনি আমার স্বামী, এই আমার সম্বল।

সুরবালার কণ্ঠে করুণার আবেদন। হট্ ওয়াটার ব্যাগটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ভাইয়ের পায়ের তলায় রেখে দিলে সুরবালা।

আবার লাথি মেরে হট্‌ ওয়াটার ব্যাগ ফেলে দিয়ে রোগশয্যা থেকে ভবতারণ বল্লেন—বল্‌বো, পুলিনকে একদিন সব বল্‌বো—

নিজের বুকটি চেপে ধরে উত্তেজিত সুরবালা বল্লে—কখনই না, কি বল্‌বে তুমি ? ”

প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য কর্‌তে কর্‌তে আবার বল্লে ভবতারণ—একদিন কিন্তু বল্‌বো ! এই কথা চিরদিন সুরবালাকে শঙ্কিত করে এসেছে। উভয়েরই বয়স প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় পৌছেচে, স্থূলকায় রুগ্ন ভাই ভবতারণ দীর্ঘকাল ধরে ধারাবাহিক অনুযোগ ও ভীতিপ্রদর্শন করে প্রায় সমবয়স্কা বোন সুরবালাকে সশঙ্কিত করে রেখেছে। সুরবালা ম্লানমুখে ভবতারণের রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নানাবিধ কটু কথা শুনে যায় এবং যথাসম্ভব অনুনয় করে উত্তর দিয়ে রুগ্ন ভাইটিকে শান্ত রাখ্‌বার চেষ্টা করে।

কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করে একটু ইতস্ততঃ করে সুরবালা বল্লে—এই ত' পরশু দিন যখন তোমার জন্যে সুরুয়া তৈরী করছিলুম, তুমি বল্লে একদম আলুনী হয়েছে, নুন নেই একটুও !

—ছিল না তাই বলেছি !—তারপর মশারির দিকে চেয়ে কতকটা আত্মগত ভাবেই ভবতারণ বল্লেন—এতদিন রান্না করেও সুরুয়ায় কতটুকু নুন দিতে হবে তাও শিখ্‌লে না, বেশীও নয়, কমও নয়, ঠিক যতটুকু দরকার। হা ভগবান্‌ !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসম সাহসে ভর করে সুরবালা আবার বল্লে—বেশ যদি বল ত' আমি না হয় নুন না দিয়ে সুরুয়া তৈরী করে দেব, তুমি ঠিক করে নুন দিয়ে নিও।

ভবতারণ হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন—যেমন বুদ্ধি তোমার, নুন না দিয়ে রাঁধবেন, নুন পরে মেশালে চলে না, রান্নার সময়েই দিতে হয়, সকলেই

একথা জানে, রোগীর মেটাবলিজমের ওপর তা'র কেমিক্যাল এ্যাক্‌সন কি হয় তা'র খবর রাখো, কিই-বা জানো, মেটাবলিজমে তোমার আর কি এসে যায়।

এই জাতীয় অনেক কথা দীর্ঘকাল ধরে ভবতারণ বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে শুনে শিখেছেন, সময় বুঝে এক-একটা অব্যর্থ প্রয়োগে সুরবালাকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দেন।

সুরবালা তবু ভয়ে ভয়ে বলে—আমি তোমার মেটাবলি জানি।

দৃঢ়কণ্ঠে ভবতারণ বলে উঠ্‌লেন—ছাই জানো—কিচ্ছু জানো না, এতদিন শেখা উচিত ছিল অনেক কিছুই, কখনও এক লাইন খবরের কাগজ পড়ো ? কত কি ঘটে যাচ্ছে তা'র খবর রাখো ? তোমার এই মূর্খতার হাতেই আমার মৃত্যু হ'বে।

—সাধ করে কি আর করছি, না এ আমার ইচ্ছে ! সুরবালা জবাব দেয়।

—নিশ্চয়ই সাধ করে, চেষ্টায় কি না হয়, চেষ্টা করেছ' কখনও !

ভবতারণ চীৎকারে যেন বিস্ফারিত হয়ে গেলেন, বাইরের বারান্দায় বেরালটা কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ্দুরে শুয়েছিল, সে একবার লেজটি উঁচু করে ভবতারণের বিছানার চারপাশে ঘুরে গেল। বাচ্ছা অবস্থা থেকে এই জাতীয় মধুর চীৎকারে সে অভ্যস্ত, কিন্তু এ' বিষয়ে তা'র অভিমত জানবার কোনও উপায় নেই। মনুষ্য-সমাজের ওপর তার যেন কতকটা অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব বর্ত্তমান, তার মার্জ্জারীয় আভিজাত্যের উচ্চতায় সে এ'সব ব্যাপারের অনেক উর্দ্ধে বিচরণ করে, সুতরাং এই ব্যাপারে তার এমন নির্লিপ্ত নিস্পৃহভাব।

বেরালটিকেও সুরবালাকে নিজের হাতে খাওয়াতে হ'বে। বাড়িতে

দাসী-চাকরের অভাব নেই, তবু ভবতারণ আর বেরাল উভয়েরই পরিচর্য্যার ভার সুরবালার হাতে, এতটুকু ত্রুটী হ'বার উপায় নেই, তা'হলেই ভবতারণ চীৎকার করে উঠ্‌বে—পুলিনকে বলে দেব!

আর এই কথাতেই সুরবালা সচকিত হয়ে উঠ্‌তো।

পুলিন সুরবালার স্বামী, মাঝে মাঝে এ'ঘরেই বস্‌তো, কিন্তু সে নিদ্রিত কি জাগ্রত সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাক্‌তো, তাই, এরা ভাইবোনে কিংবা বেড়াল কেউ তার দৃষ্টি-আকর্ষণের চেষ্টা করেনি। পুলিন যেন—'দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ, বীতরাগ ভয় ক্রোধঃ।' পুলিন কানে একটু খাটো, ছোট কথা বড় কানে পৌছয় না, কাজেই কিসের যে আন্দোলন চলেছে সব সময় সে ঠিক বুঝতে পারে না—তার কানে ফোনের মতো একটা যন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল, কানে খানিকটা গোঁজা থাকে—দু'একটা নল বুকে এসে নেমেছে, সেখানে একটা রিসিভারের মত ছোট যন্ত্র, বেশী গোলমাল হোলে পুলিন কান থেকে সে'টা খুলে নিয়ে যন্ত্রটা নামিয়ে রেখে চোখ বুজে হয় ঘুমোত, নয় ঘুমোবার ভাণ কর্‌তো।

বেলুড়ে গঙ্গার ধারে পুলিনদের মস্ত বাড়ি, এই বাড়িতেই পুলিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে, মানুষ হয়েছে, এখন শেষ জীবনে পৌছেচে, এই পৈতৃক বাড়ীর সঙ্গে সে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ পেয়েছিল। এই সম্পত্তির উপর পুলিন নিজে বিশেষ কিছু যোগ করে নি কিংবা নষ্টও করেনি এক বিন্দু। পুলিন সাদাসিধে ঠাণ্ডা মানুষ, ছেলেবেলা থেকেই গোঁড়া রক্ষণশীল

প্রকৃতির, আইন ও সমাজনীতির পরিপোষক, সম্ভ্রান্ত নাগরিক। এইসব ব্যাপার ছাড়া সংবাদ-পত্রে পুলিন '*Vox Populi*' '*Pro Bono Publico*' ইত্যাদি ছদ্মনামে প্রায়ই চিঠি লেখে, এতেও তার অনেকটা সময় ব্যয়িত হয়।

বাড়িতে অন্ততঃ বারো চোদ্দখানি ঘর আছে, তবুও ভবতারণকে কেন্দ্র করে এ'ঘরটিতেই তিনটি প্রাণীর সম্মিলনস্থান, ভবতারণ একা থাকা পছন্দ করেন না, ঘরে কেউ না থাকলে তার মনে হয় তাকে জব্দ কর্‌বার একটা ষড়যন্ত্র চলেছে। বধিরতা সত্ত্বেও পুলিন এটুকু বোঝেন যে ভবতারণের রোগশয্যায় সর্ব্বদাই একটা না একটা গোলমাল লেগেই আছে। কিন্তু এর অন্তরালের ভয়ঙ্কর নাটিকা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই, পুলিন জানে না যে এই নাটিকার প্রধানতম কেন্দ্রস্থল সে নিজে, তা'কে অনুবর্ত্তিত করেই ঘটনা-প্রবাহ চলেছে। এই পারিবারিক সন্ত্রাস-জনক ঘটনা প্রতিদিন প্রায় প্রতি ঘণ্টাতেই তা'র চোখের সামনে ঘটছে, কিন্তু সে বোঝবার শক্তি তার নেই।

বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই তিনটি বিগত যৌবন প্রৌঢ়েরা এসে পৌছেচেন। এর মধ্যে সুরবালার একবার কি যেন পদস্খলন হয়েছিল, ব্যাপারটা ঠিক যে কি ধরণের সে বিষয়ে অবশ্য কারুর কিছু জানা নেই, ভবতারণের সে সংবাদটুকু জানা আছে এবং শুধু এই কারণেই ভবতারণ সুরবালাকে ক্রীতদাসী করে রেখেছেন।

'পুলিনকে বলে দেব' এই কথাটুকু ভবতারণের মুখ থেকে উচ্চারিত

হ'লেই সুরবালা আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌তেন! কখনও মৃদুকণ্ঠে, কখনও স্বর একটু তুলে ভবতারণ সুরবালাকে ভয় দেখান, সুরবালার সারা শরীর আতঙ্কে কণ্টকিত হয়ে উঠে, মুখখানি বিবর্ণ হ'য়ে যায়, কেননা দশ হাত দূরেই পুলিন বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে চেয়ে নীরবে বসে আছে।

কিছুকাল ধরে, ঠিক কোন্ সময়ে, কতশো সালে সুরবালার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করেছিল এই নিয়ে ভাইবোনে তুমুল তর্ক হোত। ভবতারণ বলতেন—১২৯০ সালে চড়কের মেলায়, সুরবালা বল্‌তো—১২৯৮।

ভবতারণ বলতেন—মিথ্যে কথা বোলোনা সুরবালা, আমার বেশ মনে আছে। তোমাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, বাবা পুলিশে খবর দিলেন, মা কাঁদতে লাগলেন, এত' সেদিনের কথা, তিনদিন পরে ওয়াটগঞ্জের দারোগার কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, বাবা তখনই তোমাকে আনতে গেলেন।

সুরবালা কতকটা উত্তেজিত হয়েই বলে—অসুখে ভুগে তোমার মাথার ঠিক নেই দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, একি তুমি আলোচনা করছ।

ভবতারণ বলতেন—আলোচনা কি আর সাধে করি, তোমার ব্যবহারে করি, তুমি যে চরিত্রের মেয়ে!

সুরবালা আর শান্ত থাকতে পারে না—দেখ দাদা, আমি তখন কতটুকু, তারপর আমাকে গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তার জন্যে কি আমি দায়ী?

—কতটুকু বৈ কি! তখন ত' তোমার বিয়ে হ'য়েছে।

—না, তার দু'বছর পরে আমার বিয়ে হোল।

—কখনই না, আমার বেশ মনে আছে, তখন তোমার বিয়ে হ'য়েছে।

—বয়স হয়েছে তোমার, সবকথা আর তোমার এখন তেমন মনে থাকে না।

—কি বয়েস হয়েছে? কত বয়েস হয়েছে শুনি? আমার চেয়ে তুমি মোটে তিন বছরের ছোট, বয়স কি আমার একলার হ'য়েছে!

—বয়স তুজনেরই হয়েছে মানি, কিন্তু দিন রাত্তির এই পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি দাদা!

—লাভ আর লোকসান, কি যে তোমার মনে আছে কে জানে? তোমরা সব করতে পার। তারপরই ভবতারণ কাঁদ-কাঁদ হ'য়ে বলেন, —তোমাদের আশ্রয়ে আছি তাই যা খুসী তাই বলো।

সুরবালা ব্যস্ত হয়ে বলে—কেন, তোমাকে কি বলেছি দাদা? আমার যথাসাধ্য আমি তোমার সেবা করেছি, তাতেও তোমার—

ভবতারণ উত্তেজিত হ'য়ে চীৎকার করে উঠ্‌তো—কি আর বলবে, বুড়ো, মাথার ঠিক নেই, কত কি বল্লে, ব্যাপিকা রমণী কিনা—

—'দাদা—' বলে কেঁদে সুরবালা ঘর ছেড়ে চলে যায়। এমনই হয় প্রায় প্রতি দিন, একই কথার পুনরাবৃত্তি, একই অভিনয়।

পুলিন নির্ব্বাক চিত্তে যথারীতি সংবাদ-পত্রে চিঠি লিখে চলেছে, কখনও 'কম্যুন্যাল এওয়ার্ড', কখনও বা কংগ্রেস, তারপর যুদ্ধ ত' একটি ব্যাপক বিষয়, বিষয়ের কখনও অভাব ঘটে না; কিন্তু শান্ত হলেও

পুলিনের রাগ আছে, গঙ্গার ধারে ইদানীং একটু পায়ে-চলা পথ হ'য়েছে, তা নিয়ে পুলিনের আর উত্তেজনার সীমা নেই! চাকরদের হুকুম দিয়েছে, ওদিক দিয়ে কেউ গেলেই তাকে সোজা আমার কাছে ধরে নিয়ে আসবি। মাঝে মাঝে পূর্ব্বদিকের জানালার দিকে গম্ভীর ভাবে চেয়ে থাকে পুলিন।

সুরবালা বলে—ঐ এক খেয়াল, গেলেই বা বাপু ওদিক দিয়ে লোক, সোজা হয় তাই যায়।

ভবতারণ বলেন—হুঁ! সোজা হয়, এর ভেতর অনেক মানে আছে সুরো সে কথা ত' তোমার বোঝা উচিত।

সুরবালা আস্তে আস্তে কি উত্তর দেয় শোনা যায় না।

দুপূরে ঘুম ভেঙ্গে উঠেই পুলিনের প্রথম জিজ্ঞাসা,—ওদিক দিয়ে আর কোনও লোক টোক গিছল নাকি সুরবালা?

কতকটা সচকিত হ'য়েই সুরবালা বলে—কিসের লোক?

পুলিন একটু হেসে বলে—না অম্নিই বলছি—কোনো লোক যাচ্ছিল কি না! তারপর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পুলিন উৎকণ্ঠ আগ্রহে গঙ্গার দিকে চেয়েথাকে। যদি কেউ এসে পড়ে পুলিন তাকে কঠিন শাস্তি দেবে।

ভবতারণ বলেন—পুলিন যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে, আমার দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকে যেন ভুত দেখেছে। যারা ভূত দেখতে পায় সুরো, তারা তোমার মনের কথাও জানতে পারে। মনের অগোচর পাপ নেই সুরবালা, একটু সাবধানে থেকো।

হতাশার সুরে সুরবালা বলে—তোমার জন্য কি আমি আর কিছু ভাবতে পারবো না দাদা।

পৃথিবীর পরিবর্ত্তন ঘটেছে, পদার্থ-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ব্যবসা ও বাণিজ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তন ঘটেছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই দুটি ভাই-বোনের ব্যক্তিগত বিরোধের অবসান ঘটেনি। বেতার, বিমান, সিনেমা, লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এদের ভাই-বোনের বিচার বিবেচনার কোনো পরিবর্ত্তন নেই; ১২৯০ কিংবা ১২৯৮ সালে সুরবালা গুণ্ডার কবলে পড়েছিল, রোগশয্যায় শুয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ভবতারণ কিছুতেই আর সে কথা ভুলতে পারছেন না।

সুরবালা অবশেষে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্‌ল; এতকাল যে কথা চেপে রাখবার জন্যে ভবতারণকে সে ভয় করে এসেছে, আজ আর তার ভয় নেই! চোখ বুজিয়ে চেয়ারে পুলিন চুপ করে বসে আছে। বিড়ালটি জান্‌লার উপর নিঃশব্দে বসে আছে। বিছানায় শুয়ে ভবতারণ এপাশ-ওপাশ করছেন। সুরবালা চুপ করে বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে চেয়ে বসেছিল। কোনো দিন সুরবালার মনে এত উত্তাপ সঞ্চারিত হয়নি। নিস্তরঙ্গ নদীর দিকে চেয়ে সুরবালা সশব্দে হেসে উঠ্‌ল, সহসা তার মনে হয়েছে ভবতারণকে আর ভয় নেই। এ'রকম আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক হাসিতে ভবতারণ উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসলেন, তারপর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চীৎকার করে উঠলেন ভবতারণ—সুরবালার যে ভারী স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি, হাসবার কি হোল, আমার দুরবস্থা দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে না— ?

—না—তোমার অবস্থার জন্যে হাসিনি। শান্ত কণ্ঠে বল্লে সুরবালা।

—তবে হাসছ কেন? কারণটা কি শুনি?

—তোমার, আমার, আমাদের সবায়ের কথা ভেবে হাস্‌ছি। আবার হেসে ফেটে পড়লো সুরবালা।

রাগে উন্মত্ত হ'য়ে ভারী দেহের অর্দ্ধাংশ খাট থেকে নামিয়ে সুরবালাকে শাসিয়ে ভবতারণ বল্লেন—

হাসি-টাসি চলবে না, ওতে আমার কষ্ট হয়, না থাম্‌লে আমি সব কথা পুলিনকে বলে দেব!

শান্ত-সমাহিত ভঙ্গীতে হেসে সুরবালা বল্লে—বেশত' বোলো।

বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে রইলেন ভবতারণ, সুরবালার কথা তাঁর যেন বিশ্বাস হয় না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভবতারণ বল্লেন—আমাকে মেরে ফেলবে, তুমি আমার বোন!

একথার কোনও উত্তর দিলেন না সুরবালা।

অবশেষে সুরবালা অপেক্ষাকৃত উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে—

কেন হেসেছি জানো, আজ আমি বুঝেছি, আমি দ্বিচারিণী নই, আসলে তুমিই চরিত্রহীন। নিজের চরিত্রের কথা তোমাকে পীড়িত করে তোলে, তাই তুমি অক্ষম আক্রোশে আমাকে এতকাল পীড়ন করে এসেছ, আর আমি তোমাকে ভয় করিনা দাদা।

বিশ্রী চীৎকার করে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন ভবতারণ; তারপর পুলিনের কানের কাছে গিয়ে বল্লেন,—জানো, তোমার স্ত্রী, আমার বোন সুরো, দ্বিচারিণী।

তন্দ্রার ঘোর ভাল করে কাটেনি পুলিনের—সে বল্লে হুঁ।

ভবতারণ বলতে লাগলেন—১২৯৭ সালে গুণ্ডারা ওকে ধরে নিয়ে গিছ্‌ল। উন্মত্ত উত্তেজনায় ভবতারণের রুগ্ন শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ল, কথাগুলো বলবার সময় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল,

পুলিনের টেলিফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলে ভবতারণ আর দাঁড়াতে পারলেন না, চেয়ারের পাশে বসে পড়লেন।

পুলিন আর একবার বল্লে—কার কথা বল্লে ?

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে সুরবালা মনে মনে পরম প্রশান্তি অনুভব করছিল। এতদিনে তার অন্তরে শান্তি এলো।

পুলিন চেয়ার থেকে উঠে বল্লে—কি হয়েছে সুরবালা, ভবতারণ রাগ করেছে বুঝি।

ভবতারণ আবার বল্লেন—দ্বিচারিণী, সুরবালা দ্বিচারিণী !

উত্তেজনায় অবসন্ন হয়ে ভবতারণের বিপুল দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিন বল্লে সুরবালা, ভবতারণের শরীরটা বোধ হয় আবার খারাপ হোল।

অচঞ্চল সুরবালা শুধু বল্লে হুঁ ! তোমাকে যা বল্‌তে চেয়েছিল, তা' তুমি শুনতে পেলেনা বলেই রাগে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে !

পুলিন একথাও শুনতে পেলে না,—বল্লে একবার ডাক্তার বাবুকে খবর দাও।

সুরবালা বল্লে—তা, ডাক্‌ছি কিন্তু তাতে আর বোধ করি বিশেষ ফল হ'বে না।

সুরবালার কথা সত্যি হোল, ভবতারণের আর জ্ঞান হোল না।

শ্মশান থেকে ফিরে এসে পুলিন বল্লে—তাইত সুরবালা, তোমার বড় কষ্ট হ'বে, একলা কি নিয়ে থাকবে !

পাষাণ প্রতিমার মতো চুপ করে সুরবালা দাঁড়িয়ে রইলো।

পুলিন বল্লে—কিন্তু কি যেন বলছিল, তেমন বোঝা গেল না সুরবালা।

নদীর দিকের জানলার ধারে উদ্দেশ্যহীন উদাস দৃষ্টিতে সুরবালা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

খাঁচার পাখী

গৃহ প্রবেশের দিন থেকেই নিরঞ্জন রাসবিহারী এ্যাভিন্যুর এই ফ্ল্যাট্‌টিতে বাস করেছে। আলিপুর কোর্টে এতদিনে নিরঞ্জন যা হোক্ তবু কিছু নাম করছে, প্রয়োজনের পরিমাপে অর্থের পরিমাণও তেমন অকিঞ্চিৎকর নয়, অভাব তেমন কিছুরই নেই, শুধু যদি তার একটি ছেলে কিংবা মেয়ে থাকতো। একথা মনে মনে ভাবলেও নিরঞ্জন সুমিত্রাকে কোনদিন বলেনি, সুমিত্রা নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে আছে, নিরঞ্জনের দুঃখ সুমিত্রার জন্য, কি ভয়াবহ নিঃসঙ্গতার মধ্যেই না বেচারীর দিন কাটে।

বৈচিত্র্যের অভাবে সুমিত্রার ব্যবহার আজকাল অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে এসেছে, যদিও তার মধ্যে আন্তরিকতার উষ্ণতার অভাব নেই তবুও কেমন যেন গতানুগতিক। কোর্টে যাবার আগে সে নিরঞ্জনকে কোট পরিয়ে দেবে, নিজ হাতে টাই বেঁধে দেবে, দরকারী কাগজপত্র এ্যাটাসে কেসে ভর্ত্তি করে হাতের কাছে গোছ করে রেখে দেবে, চুলগুলি ব্রাস করবার আগে কানের পাশ থেকে দু চারগাছা রূপালি চুলও মাঝে মাঝে সে খুঁজে বার করে, তারপর মোজা ও জুতা পরিয়ে দিয়ে তবে সুমিত্রার ছুটী। সিঁড়ি পর্য্যন্ত নিরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—

যতক্ষণ না ভারী জুতার আওয়াজ মিলিয়ে যায়, ততক্ষণে সুমিত্রা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নিরঞ্জন হেসে বলতো সেকালে রাজারা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন রাণীরা বীর বেশে রাজাকে সাজিয়ে দিতেন, তুমিও দেখছি তাই কর্‌লে। সুমিত্রা বলে উঠতো কোনখানটা তোমার যুদ্ধ নয় বলতো, হাকিমকে জয় করা কি সহজ নাকি, সেকালে ছিল সশস্ত্র কাটাকাটি, এখন নিরস্ত্র কথা নিয়ে অহিংস কাটাকাটি। সুমিত্রা দেখতে লাগল, বালীগঞ্জের দিক থেকে একটা ট্রাম আসছে অনেক করে নিরঞ্জনের একটু বসবার জায়গা হোল, নিরঞ্জন ওপরের দিকে তাকাবার আগেই ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিয়েছে, ট্রাম ক্রমশঃ মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে সুমিত্রার অবসর হোল—অখণ্ড অবকাশ। সুমিত্রা ঘরে ফিরে এলো। সুসজ্জিত ঘরখানি, সুনিপুণ হাতের স্পর্শে ঘরের কোনো জিনিষটি স্থানচ্যুত হয়ে নেই, অতিথি এলে এদের পরিচ্ছন্ন পারিপাট্যে বিস্ময় প্রকাশ কর্‌তেই হবে। ঘড়ির কাঁটার মতো নিয়মিতভাবে সুপরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত ঘরটিকে পরিচ্ছন্নতর করবার মূলে আছে সুমিত্রার অদম্য আগ্রহ।

তারপর নিঃসঙ্গ সুমিত্রা কোনও প্রকারে স্নানাহার সেরে বসবার ঘরে ফিরে এলো। সামান্য কয়েকটি মুহূর্ত্ত অবসন্নভাবে সুমিত্রা চুপ করে বসে রইল, তারপর বেরিয়ে এলো বাইরের বারান্দায়, সেখানে ছোট বড় অসংখ্য মাটির টবে নানারকম মৌসুমী ফুলের গাছ সে স্বহস্তে বসিয়েছে, চন্দ্রমল্লিকাগুলি ফোটার সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু পিঁপড়ের চেয়ে ছোট

ছোট একরকম পোকা গাছগুলিতে ছড়িয়ে আছে, সহজে যে ফুল ফুটবে এমন ভরসা নেই, সুমিত্রার মুখখানি সহসা ম্লান হয়ে গেল।

গাছের পরিচর্য্যা শেষ হোল—এখন নিশ্ছিদ্র মোলায়েম একটানা সুদীর্ঘ অবসর। তারপর অনেক পরে দুপুরের সোনালি রোদ গিয়ে পড়ল পার্কের একমাত্র তাল গাছটির মাথায়। ফিরিওয়ালার কলরবে আবার বড় রাস্তা মুখর হয়ে উঠল, ট্রামবাস মোটরের আওয়াজে মূর্চ্ছাহত সহরের যেন পুনর্জ্জন্ম হোল, দ্বিপ্রহরের অলঙ্ঘনীয় অলসতার আকর্ষণের হাত থেকে এতক্ষণে তার মুক্তি হোল। সহরের সঙ্গে সুমিত্রারও আবার যেন পুনর্জ্জন্ম হোল, নিরঞ্জনের ফেরার সময় ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে। মধ্যাহ্নের এই ক্লান্তিকর নিঃসঙ্গ অবসর সুমিত্রার জীবনের প্রধানতম তিরস্কার। এই বাড়ীটিতে তিনটী ফ্ল্যাট্, নীচে একটি, ওপরে দুটি, নীচেরটি বাড়ীওয়ালার জন্য বারোমাস রিজার্ভ, তিনি থাকেন বর্দ্ধমানে, কদাচিৎ অর্দ্ধোদয় কিংবা চূড়ামণি যোগে তাঁর বাড়ীর মেয়েরা কল্‌কাতায় এলে এখানে থাকেন, নইলে কর্ত্তা একাই মাঝে মাঝে দু একদিন থেকে যান ; নীচেরতলা বারোমাস খালিই থাকে, ওপরের ফ্ল্যাট্ দুটির একটিতে সুমিত্রারা থাকে, অপরটিতে যদি ওদেরই মতো কেউ এসে থাকে তবু সুমিত্রার নিঃসঙ্গতা দূর হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই তিন নম্বরের ফ্ল্যাট্‌টি, এতদিন হয়ে গেল এ পর্য্যন্ত একঘর স্থায়ী পরিবার এলো না, অনেক কষ্টে যদিই বা কেউ এলো বড় জোর একমাস কি দেড় মাস থেকেই তারা চলে যায়। তাই বিরক্ত হয়ে সুমিত্রা নবাগতদের সঙ্গে আলাপ করা ছেড়েই দিয়েছে, কি হবে দুদিনের আলাপে, যেন ট্রেনের আলাপ, যতক্ষণ গাড়ীতে ততক্ষণ এক মন এক প্রাণ...তারপর...

একান্ত দুঃসহ হলে সুমিত্রা রাস্তার দিকে জানালাটিতে দাঁড়ায়, নীচের

মন্থর জনপ্রবাহের আকর্ষণ বড় কম নয়, কালের বিস্তীর্ণ পটভূমিকার যেন চলমান দীর্ঘ কাহিনী, আদি নেই—অন্ত নেই—অতল পারাবার। তবু সুমিত্রা মাঝে মাঝে ভাবে যদি কেউ তিন নম্বরে আসে—এবার যারা আসবে তারা হয়ত বেশীদিন থাকতেও পারে। মাঝে যারা এসেছিল তারা ভাড়াটে বটে, ওঃ দিনগুলি কি ভাবেই না কেটেছে, কর্ত্তার আস্ফালন, গিন্নীর একঘেয়ে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি, ছোট ছেলেদের উৎপাত, তদুপরি একটী গ্রামোফোন, একই রেকর্ডের অবিরাম পুনরাবৃত্তি, জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে বেজে উঠল...'এমন দিনে তারে বলা যায়', দারুণ শীতের দিনে বাজলো "প্রখর তপন তাপে", অসহ্য। সঙ্গীত যে কতখানি কদর্য্য হতে পারে তা সেই ক'দিনেই সুমিত্রা বুঝেছিল, এর চেয়ে যেন নিঃসঙ্গ জীবন ছিল ঈশ্বরের প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ।

ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজতে চল্লো—সুমিত্রা জড়তার ঘোর কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালো, মধ্যাহ্নের অবসাদক্লিষ্ট মুখে স্বাভাবিক প্রসন্নতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো। নিরঞ্জনের কাপড়-চোপড়গুলি গুছিয়ে হাতের কাছে সাজিয়ে রাখল—ঘড়ির কাঁটা পাঁচটার গায়ে সরে এসেছে, চায়ের সরঞ্জাম ঠিক করে ষ্টোভটি ধরিয়ে সুমিত্রা উন্মুখ হয়ে রাস্তার ধারের জানালাটীতে এসে দাঁড়ালো।

চায়ের জল ফুটে গেল, কিন্তু নিরঞ্জনের দেখা নেই, টিপটে জল ঢেলে সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হয়ে আবার জানালার ধারে এলো, যথাসময়ে নিরঞ্জন ট্রাম থেকে নামলো। সুমিত্রার বুক থেকে যেন একটা ভারী বোঝা নেমে গেল, এ সহরে বিপদের অভাব নেই, দুর্ঘটনা একটা ঘটতে কতক্ষণ। হাসিভরা মুখে নিরঞ্জনের হাত থেকে এ্যাটাসে কেসটী নিয়ে সুমিত্রা যথাস্থানে রেখে দিল।

নিরঞ্জন বল্লে—চলোনা আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক, পিসিমা শুন্‌লাম মনোহরপুকুরে এসে রয়েছেন ক'দিন, সংক্রান্তির আগেই আবার কাশী চলে যাবেন, যাবে ওখানে—?

সুমিত্রার অসম্মতি নেই, সারাদিনের এই নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে তবু সে একটু বৈচিত্র্য, তারপর আবার সেই চিরাচরিত প্রথায় দিন যাপনের গ্লানি, সেত আছেই...

সুমিত্রা সহসা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো, কই আজ তুমি আমার সেই অরেঞ্জ রঙের উল আন্‌লে না ত'? নমুনাটা কই, ভুলে গেছ ত', বেশ !

অনুতপ্ত নিরঞ্জনের অপরাধীর মতো ম্লান মুখ দেখে সে সহজেই ক্ষমা করলো, জীবনের গতি যেখানে মসৃণ, ক্ষমা সেখানে দুর্লভ নয়।

সেদিনও সুমিত্রা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, সহসা একটা ট্যাক্সি এসে ঠিক ওদের দরজার সামনেই দাঁড়ালো, সুমিত্রা উৎসুক ও উৎকণ্ঠ হয়ে উঠলো, ঠিক এই সময়ে সে একজনেরই প্রতীক্ষা করে, জনতার অরণ্যে অবগাহন করবার সময় এখন নয়, তবু—

ট্যাক্সি থামতেই বেরিয়ে এলো সুশ্রী সুদর্শন একটী ছেলে, বছর পঁচিশ বয়স হবে হয়ত, মুখে চোখে আভিজাত্যের ছাপ, ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি থেকে যে মেয়েটী নেমে পড়ল, নিঃসন্দেহে সে তার স্ত্রী, অন্ততঃ সুমিত্রার তাই মনে হলো। মেয়েটি বেশ, কেমন যেন ব্রীড়ানম্র কুণ্ঠিত তার মুখভঙ্গী, মেয়েটি সুমিত্রাকে সহজেই আকৃষ্ট করলো। কিন্তু ওরা কার কাছে এলো, সঙ্গে বিশেষ জিনিষ পত্তর নেই, ঐ কটি জিনিষ

নিয়ে কেউ বাসা বাঁধে নাকি, দারোয়ানের সঙ্গে ছেলেটীর কি যেন কথা হোল, তারপর দারোয়ানজী নিজেই হোল্ড-অল আর স্যুটকেশটীকে ঘাড়ে করে ওপরে উঠতে লাগলো, কতই যেন পরিচিত এই বাড়ী, মেয়েটী তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এলো। পাশের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে হোল্ড-অল আর স্যুটকেশটা নামিয়ে দারোয়ানজী চাবী খুলে হুজুরদের সেলাম করলো। সুমিত্রা নির্লিপ্তভাবে রাস্তার দিকে ফিরে দাঁড়ালো।

আজ নিরঞ্জনের আসতে দেরী হচ্ছে, হয়ত কোনও মক্কেলের হাতে পড়েছে, নয়ত অরেঞ্জ রঙের উল পাওয়া যাচ্ছেনা, দোকানে দোকানে খুঁজতে নিরঞ্জনের দেরী হচ্ছে। অবশেষে সাতটার পর নিরঞ্জন ফিরলো, সুমিত্রা তখনও জানালার ধারে দাঁড়িয়ে, নিরঞ্জনের আবির্ভাব সে অনুভব করেনি, তাই নিরঞ্জন যখন তাকে জানালার ধারে আবিষ্কার করলো তখন সুমিত্রা রীতিমত লজ্জিত হয়ে পড়লো।

উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে সুমিত্রা বলল—জানো আজ আমাদের পাশে কারা এসেছে? নূতন ভাড়াটে—

—তাই নাকি! কিন্তু—

—তুমি বুঝি দেখতে পেলে না, সত্যি—ভারী ছেলে মানুষ, কি করে যে সংসার করবে কে জানে? আসবাবের ভেতর একটা হোল্ড-অল আর স্যুটকেশ। এই নিয়ে কি কেউ বাসা করে?

—তা হয়ত করে, ওদের অভিজ্ঞতায় তোমার এই অনাস্থার কারণ কি?

—ওটা কি, ওঃ উল এনেছো বুঝি, তাই বুঝি এত রাত হোল—আচ্ছা, কি বুদ্ধি তোমার, যখন পেলেনা সোজা বাড়ী চলে এলেনা কেন! আর একদিন ছুটীর দিনেই না হয় কিনে আন্‌তে।

—শীত চলে গেলে কি স্কার্ফ বুনবে নাকি, নভেম্বরের আজ ক'দিন হোল ?

—ভারী চমৎকার হয়েছে। প্যাকেটটা খুলে সুমিত্রা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

নিরঞ্জন হেসে বল্লে—তা চমৎকার না হয় হোল। কিন্তু নতুন ভাড়াটের গ্রামোফোন আছে কিনা দেখেছ ?

সুমিত্রাও হেসে উঠল...না না গ্রামোফোন নেই বটে তবে—সুমিত্রা সহসা থেমে গেল, লম্বা বাস্‌কোটায় কি আছে কে জানে, হয়ত মেয়েটির একটা এস্রাজ-ই আছে।

ভীত হয়ে নিরঞ্জন বল্লে—তার মানে ? তাহলে—

—না না ভয় নেই, ওদের সঙ্গে আলাপ করো না, বেশ হবে'খন !

—কেন ?

—সে তুমি ওদের না দেখলে বুঝতে পারবে না !

সুমিত্রার উৎসাহের উত্তাপ নিরঞ্জনকে স্পর্শ করতে পারলে না, রাত্রির আহারের পর সুমিত্রা আর একবার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু বৃথা, নিস্পৃহ নিরঞ্জনের এ বিষয়ে কোনও আগ্রহ নেই, সম্পূর্ণ অবিচলিতভাবে নিরঞ্জন শুধু নিস্প্রাণ কণ্ঠে সুমিত্রার কথায় সায় দিয়ে গেল।

অগত্যা সুমিত্রা নিজেই নবাগতদের কথা চিন্তা করতে লাগলো। গভীর রাত্রে সহসা ঘুম ভেঙে যেতে সুমিত্রার কাণে এস্রাজের মিহি সুরের রেশ ভেসে এলো, এ সুর যে অভিজ্ঞ হাতের তা বুঝতে সুমিত্রার দেরী হোল না, কিন্তু সে মনে মনে স্থির করলো নিরঞ্জনকে কোনোদিনই এ কথা জানান হবে না।

সেদিন চন্দ্রমল্লিকাগুলিতে জল দিতে গিয়ে সুমিত্রা দেখ্‌তে পেল

ছেলেটি স্বহস্তে ঝাড়ু দিয়ে ঘর পরিষ্কার করছে, বিতৃষ্ণায় সুমিত্রার মন বিষিয়ে উঠলো, কি আশ্চর্য্য, স্ত্রী কাছে রয়েছে আর স্বামী কি না নিজে ঝাড়ু দিচ্ছে, কি দিনকালই পড়েছে !

এই বিচিত্র ঘটনাটি সেদিন সন্ধ্যায় নিরঞ্জনের কাছে গল্প করতে সুমিত্রা ভুললো না, নিরঞ্জন তাচ্ছিল্যভরে বল্লে—হাতে কাজ না থাকলে অমন অনেক স্বামীকেই ঝাড়ু দিতে হয়।

সুমিত্রা বিরক্ত হয়ে বললে—তুমি কি করে জানলে ওদের কাজ নেই।

থাকলে কি আর ঝাড়ু দিত সুমী,—কাজই করতো !

—হয়ত এখন ওঁর ছুটি, ওদের যা জামা কাপড় সেদিন দেখতে পেলুম, তাতে আমার মনে হয় ওদের বেশ সচ্ছল অবস্থা।

—তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই, আজকাল ক্রমশঃ-শোধ্য উপায়ে জামা কাপড়ও কেনা যায়, মাসে পাঁচটাকা করে দিলেই হোল, তাছাড়া আসল আর নকল, জাপানী কিংবা বিলাতী তুমি চিনবে কি করে !

—কিন্তু ওদের চেহারা দেখে আমার মনে হয় নকল নয়—

—হ'তেও পারে, কত রকমেরই না লোক আছে। খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই নিরঞ্জন বল্লে, অপস্রিয়মান সিগ্রেটের নীলাভ ধোঁয়াটুকু শুধু দেখা গেল।

নিরঞ্জনের কঠিন ঔদাস্যের হিমেল হাওয়ায় সুমিত্রার আগ্রহ শীতল হয়ে গেল। অগত্যা নিবিষ্ট মনে ক্রচেটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সুমিত্রা আপন মনে এই নবাগত দম্পতির সম্বন্ধে কল্পনার জাল রচনা করতে লাগলো !

তারপরদিন দুপুরে সুমিত্রার পরিচিত ডিমওয়ালার কাছে সুমিত্রা বেছে বেছে ডিম কিনছিল, এমন সময়ে মেয়েটি বেরিয়ে এলো পাশের ঘর থেকে। এই প্রথম তাকে সম্পূর্ণভাবে সুমিত্রা দেখলে, পরণে তার ফিকে আস্‌মানি রঙের সাড়ি, কপালে সিঁদুরের ক্ষীণ স্পর্শ, সুমিত্রার বেশ লাগ্‌লো—

মেয়েটি সবিনয়ে নমস্কার করে বল্‌লো—আপনি পাশেই থাকেন না?

আজ ক'দিন ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বো মনে কর্‌ছি, কিন্তু কিছুতেই আর সময় করে উঠতে পারিনি।

সুমিত্রারই যেন অপরাধ, সুমিত্রা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—তাতে কি হয়েছে, প্রথম দুচারদিন একটু অসুবিধা হয় বৈকি!

—আসুন না আমাদের ঘরে, আপনার অসুবিধা হবে না ত'!

—অসুবিধা আর কি বলুন! সুমিত্রা যেন আত্ম-সমর্পণ কর্‌লে। মনে মনে সে আনন্দিত হোল, মেয়েটিকে যতটা দাম্ভিক মনে করেছিল, তা ভুল।

ওদের ঘরে ঢুকে সুমিত্রার মনে হোল, এমন ঘরে জীবনে যেন ও প্রথম এলো, কি বিশৃঙ্খল বিশ্রী-করেই না সব রেখেছে।

মেয়েটি বল্লে—বসুন, আপনাকে একটু চা করে দিই! জিনিসপত্র সব ছড়ান এলো-মেলো হয়ে রয়েছে।

সুমিত্রা বল্লে—এতো বেলায় আর চায়ের হাঙ্গাম কর্‌বেন না। মেয়েটি কিন্তু আপত্তি শুন্‌লে না।

এই অবসরে সুমিত্রা ওদের ঘরটি দেখ্‌তে লাগলো, সামনে একটি ছোট বেতের টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম অপরিষ্কার অবস্থায় পড়ে রয়েছে, অপরিচ্ছন্ন বিছানার ওপর দুচারখানি বই ছড়ানো রয়েছে, পাশের ঘরের মেঝেতে একটি সস্‌প্যান ও দু-চারটি কাঁচের এবং চীনে মাটির বাসন দেখা গেল, জামা কাপড় ঘরের মেঝেতেই ছড়ানো রয়েছে, বাথরুমে চৌবাচ্চার কাছে ভিজে কাপড় তখনো জড়ো করা রয়েছে। মেয়েটি যে সংসারে অনভ্যস্ত সে বিষয়ে সুমিত্রার কোনও সন্দেহ রহিল না।

মেঝের ওপর ষ্টোভ জেলে মেয়েটি চায়ের জল চড়িয়েছিল, একটু ধোঁয়া দেখা যেতেই তাতে তাড়াতাড়ি পাতা ছেড়ে দিয়েছে। বিস্মিত হয়ে সুমিত্রা বল্লে……একি! জল ত ফোটেনি এখনও এর মধ্যেই পাতা দিলেন যে?

মেয়েটি বিশেষ লজ্জিত হয়ে পড়্‌লো, সুমিত্রা সহসা দেখল ওর চোখে জল, সুমিত্রা অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—তাতে কি হয়েছে, ওতেও চা ভালোই হয়।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মেয়েটি বল্লে—আমারই ভুল, আপনি ঠিকই বলেছেন এর জন্য আমিই অপরাধী, কোনোদিন এসব শিখিনি তার ফল ভোগ কর্‌ছি। কদিন দোকান থেকেই খাবার আস্‌ছিল, আজ ওঁর ইচ্ছে হোল আমার হাতের রান্না খাবেন, রেঁধেও ছিলুম, কিন্তু উনি কিছুই মুখে কর্‌তে পারেন নি, না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন এখনও হয়ত অভুক্ত আছেন। এই পর্য্যন্ত বলে মেয়েটি অশ্রুধারায় ভেঙে পড়ল।

কিন্তু বেশী বিব্রত হোল সুমিত্রা, বেচারী সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল এদের জীবনযাত্রার মসৃণ পথে কোথায়

বাধা পড়েছে। করুণায় সুমিত্রার মন আর্দ্র হয়ে উঠল, সান্ত্বনার সুরে বল্লে

তাতে আর কি হয়েছে, আমি আপনাকে সব শিখিয়ে দেব, আসুন আমি বিকালের খাবারের সব বন্দোবস্ত করে দিই, ততক্ষণে আপনার স্বামী এসে পড়্‌বেন।

সুমিত্রার সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। মেয়েটিকে সাহায্য করতে পেরে সুমিত্রা খুসী হয়েছে।

এমন সময় জুতার আওয়াজ পেয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটি ফিরে এসেছে, হাতে তার নানা রকম প্যাকেট, সুমিত্রা বুঝলে এইবার সন্ধি, তার পক্ষে এখানে আর থাকা নিস্প্রয়োজন, কিন্তু দরজার সাম্‌নেই ওরা দাঁড়িয়ে, বেরোবার পথ নেই।

—সত্যি অনু, আমাকে মাপ করো, বড় অন্যায় হয়ে গেছে, সকালে রাগের মাথায় তোমাকে যা তা বলা মোটেই উচিত হয় নি। ছেলেটি আবেগ আকুল কণ্ঠে বললে।

অনু বোধ হয় ইসারায় কিছু বলে থাকবে, ঘরে তৃতীয় প্রাণীর উপস্থিতি এতক্ষণে ছেলেটিকে সচকিত করল।

—নমস্কার—সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে ছেলেটি বল্লে, আপনারা পাশেই থাকেন, না? অনু—এঁকে বস্‌তে দাও।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে সুমিত্রা বল্লে—অনেকক্ষণ এসেছি, আজ আর সময় নেই।

মেয়েটি সুমিত্রাকে ঘর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

সে রাতেও স্থমিত্রা নিরঞ্জনকে এ ঘটনা জানালো না, রাতে বিনিদ্র শয্যায় মেয়েটির কথাই বার বার স্থমিত্রার মনে পড়্তে লাগলো। অদ্ভুত এই মেয়েটি, যেমন সুশ্রী তেমনই সরল ওর ব্যবহার। স্থমিত্রার মায়া পড়েছে অনুর ওপর, হয়ত অনুপমা, কিংবা অনীতা ওর নাম হবে। কে জানে স্থমিত্রার যদি মেয়ে থাক্তো সে কি অনুপমার বয়সী হোত, হয়ত কিছু ছোট হত, যাহোক এতদিনে তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল, মেয়েটিকে স্থমিত্রা কাজ শেখাবে, মেয়েটিকে সংসার কর্‌তে শেখাবে। নিরঞ্জনের সকল ব্যাপারেই কেমন অকারণ ঔদাসীন্য। আজ প্রথম স্থমিত্রা নিরঞ্জনের ওপর রাগ কর্‌লো এবং অনুদের সব কিছুই ওর কাছে সুন্দর ও পরম রমণীয় বলে মনে হতে লাগলো।

সে রাত্রিতে কিছুতেই স্থমিত্রার চোখে আর ঘুম এলো না।

পরের দিন স্থমিত্রা অনুদের ঘরে যাবে কি না ভাব্‌ছে ঠিক সেই সময় মস্ত একখানি গাড়ি এসে থাম্‌লো, অতবড় গাড়ি এ পাড়ায় কেন এলো স্থমিত্রা কৌতূহলী হয়ে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লো। চাপরাশ পরা এক আর্দ্দালী সসম্ভ্রমে দরজা খুলে দাঁড়াতেই বেরিয়ে এলেন সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, দেহটি স্থূল হলেও উজ্জ্বল, প্রশস্ত ললাটে প্রতিভার পরিচয় আছে, পাশের ফ্ল্যাটে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনু ও তার স্বামী এবং সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ফ্ল্যাট থেকে, পেছনে চাকরের মাথায় স্থমিত্রার পরিচিত সেই হোল্ডঅল্ ও স্থটকেশ। সকলে অকুণ্ঠিতচিত্তে গাড়িতে উঠে পড়্‌লো, শুধু চকিতে অনুর চোখ স্থমিত্রার মুখের দিকে পড়্‌তে সে হাত দুটি তুলে স্থমিত্রাকে নমস্কার জানালে—

তারপর সেই বিরাট মোটরকারখানি রাসবিহারী এভিন্যুর জনারণ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল, সুমিত্রা ঝাপসা চোখে তার সন্ধান করতে পারলে না।

সেদিন সুমিত্রা নিরঞ্জনকে বল্লে—জানো ওরা আজ চলে গেছে। নিস্পৃহভাবে নিরঞ্জন বল্লে—বিচিত্র কি! এ আমি জান্‌তুম।

সুমিত্রা কিছু আর বল্‌তে পারল না, তার মনে বার বার অন্তুর মুখখানি ভেসে বেড়াতে লাগল।

সুমিত্রার নিস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গ মধ্যাহ্ন দিনগুলি আবার বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

ইন্দ্রজাল

ইন্দিরা এসে ঘরে ঢুকলো···পরনে ঘন-নীল সাড়ি, কাণে আধুনিকতম দুল, হাতে শ্যাচেল। অঙ্গরাগের প্রাচুর্য্যে ইন্দিরার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর হয়েছে, প্রসাধনের কলাকৌশলে সে নিপুণা।

জয়ন্ত দরজার দিকে পিছন ফিরে সোফায় বসে সদ্যক্রীত একখানি বই পড়ছিল, সহসা এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হোল না। বিরক্তি ও ক্রোধে সুন্দর মুখখানি বিকৃত করে ইন্দিরা মসৃণকণ্ঠে বলে উঠলো—তা' হলে কি করা যাবে এখন, যাই হোক লীলাদের বাড়ী আমাকে যেতেই হবে। অসুখের আর সময় নেই, আজ-ই অজিতের অসুখ করলো।

—রাগ করছ কেন ইন্দু, জয়ন্ত শান্ত স্বরে বল্লে, আমিই ড্রাইভ্ কর্‌বো।

—না, তা হতেই পারে না, সকলে কি ভাববে বলো ত? একটা শোফার রাখবার ক্ষমতা যেন আমাদের নেই। আজকের মতো এই পার্টিতে শোফারহীন অবস্থা যে কত অসম্মানের তা কি তুমি জানো না? এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে রয়েছি, আজই অজিত নেই! শেষের কথাগুলি অশ্রুজড়িত হয়ে এলো।

জয়ন্ত দুর্ব্বল গলায় বলে উঠলো—উপায় কি! অজিত ত' আর ইচ্ছে করে অসুখ বাধিয়ে বসে নাই, হঠাৎ এখনই লোক পাওয়া কঠিন, আমি যদি স্বয়ং চালাই তাতে কি অপমান হবে। আর যদি তুমি নাই যাও তাতেই···

—না যাওয়ার কথা উঠতেই পারে না, বাধা দিয়ে ইন্দিরার স্বর ঝঙ্কৃত হলো, যেতে আমাকে হবেই। একান্তই যদি উপায় না হয়, তুমিই চলো, আশ্চর্য্য!

কিন্তু জয়ন্ত ততক্ষণ আর শেষের কথা শোনবার জন্য বসে নেই। কয়েক মিনিট পরে সুপরিচিত হর্ণের আওয়াজে ইন্দিরার চমক ভাঙ্‌লো।

জয়ন্তর বাড়ী অভিজাত পল্লীর শেষ প্রান্তে। সেখান থেকে লীলাদের বাড়ী অন্ততঃ পাঁচ মাইল; শীতের সন্ধ্যার প্রান্তদিকে কলিকাতার এই জনবিরল নির্জ্জন প্রান্তর কোনো শান্তিকামী যুবকের কার-ড্রাইভকরা মনকে পুলকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে না। কিন্তু নিরুপায় জয়ন্তের এ ছাড়া আর কি উপায় আছে। গৃহের নির্জ্জনতার মধ্যে কৌচে আবক্ষ নিমজ্জিত থেকে, আবছা আলো-অন্ধকারের মায়ায় পুস্তকের রসগ্রহণ করা কাম্য হোলেও ইন্দিরার কমনীয় মুখের হাসি অধিকতর কাম্য,—অতএব জয়ন্ত পথে বেরিয়ে পড়লো।

আজ জয়ন্তর মনে পড়ছে বিবাহিত জীবনের গোড়ার কথা। অবস্থা, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে শুধু দিন যাপনের গ্লানির পক্ষে যথেষ্ট হলেও তার ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ স্যার নিরঞ্জন মল্লিকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করবার পক্ষে যথেষ্ট পাসপোর্ট নয়। স্যার নিরঞ্জন—যিনি সামান্য ইন্সিয়োরেন্সের এজেন্ট থেকে আজ দুটো কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার, অসামান্য কর্ম্ম-প্রতিভা ও বুদ্ধির প্রাখর্য্যে যিনি অগাধ সম্পত্তি সঞ্চয় করেছেন, আজ যিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের শিরোমণি—তাঁর মেয়ের পাণিপীড়নের কল্পনা জয়ন্ত কখনও করেনি। একদা এক পরম রমণীয় মুহূর্ত্তে নিতান্ত আকস্মিকভাবে ইন্দিরার সঙ্গে তার পরিচয় হোল।

জয়ন্ত সবে মেডিকেল কলেজের সীমানা পেরিয়েছে। ইন্দিরা মল্লিকের নাম তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছে সুপরিচিত। কলেজের ছেলেরা ইন্দিরার নৃত্যে মুগ্ধ, তার চার পাশে লুব্ধ ভ্রমরের মতো সুবেশ যুবকের ভীড়। ইন্দিরার স্তব-গুঞ্জনে কবিকুঞ্জ মুখরিত। ইন্দিরার নরম ব্যবহারে অনেকেই মনে মনে রঙীন কল্পনার জাল রচনা করতে লাগলো। সেই ইন্দিরা যখন স্বেচ্ছায় জয়ন্তর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো তখন মুগ্ধ জয়ন্ত আপন সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হয়ে তাকে বরণ করলো, বরণ করলো বটে, কিন্তু জয়ন্ত আত্মহারা হোল না। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে সচেতন, সুতরাং সে মিলনের প্রস্তাব করতে সাহসী হোল না। এমন সময় এলো ইন্দিরার ইঙ্গিত, ঐশ্বর্য্য তার ভালো লাগে না, সোসাইটি তার কাছে বোরিং, চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি তার কাছে ম্লান, নিষ্প্রভ···জীবনে নেই সুখ, অন্তরে নেই শান্তি। জয়ন্ত নির্ব্বোধ নয়, অতএব জয়ন্ত একদা সাহসী হয়ে কথাটা তুললো এবং তার-ই ফলে আজ ইন্দিরা তার জীবন-সঙ্গিনী।

কিন্তু কোথায় যেন একটা বিস্তীর্ণ ব্যবধান ছিলো, সেটা আত্মপ্রকাশ করলো বিবাহের পর, অভিজাত সম্প্রদায়ের মুকুটমণি হয়ে থাকবার উজ্জ্বল উৎসাহ তার শান্তিপ্রিয় মনকে পীড়িত করলো একবছরের ভেতর। অদম্য তার আকাঙ্ক্ষা, প্রশংসনীয় তার রূপসজ্জা, মনোহর তার চারুকণ্ঠের মসৃণ সঙ্গীত।

এমন সময়ে এলো সুশান্ত, ওদের প্রথম সন্তান, ইন্দিরার উগ্র আকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হোল, কিন্তু তা সাময়িক। জয়ন্ত সম্প্রতি

লক্ষ্য করেছে যে, ইন্দিরার পূর্ব্ব রোগ ক্রমশঃই প্রবল হয়ে উঠছে, পুরাতন জীবনের জন্য সে আবার ব্যাকুল হয়ে উঠ্ছে। শান্তিকামী জয়ন্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতি তেমন আকৃষ্ট নয়, সুতরাং ইন্দিরার এই প্রচেষ্টায় সে তেমন খুসী হতে পারেনি।

আজকের উৎসবে যাবার আগ্রহের ঐকান্তিকতা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। আরও লক্ষ্য করেছে জয়ন্ত—ইন্দিরার কাণে লাল পাথরের দুল দুটির পরিবর্ত্তে রয়েছে স্যার নিরঞ্জনের সেই হীরে বসান ঝুম্‌কো। জয়ন্তর দেওয়া কণ্ঠহার আর ইন্দিরার বরতনু বেষ্টন করে সুকুমার দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি কর্‌ছে না, সেখানে স্যার নিরঞ্জনের প্লাটিনাম্ নেক্‌লেস্ দ্যুতিমান;··· ঘটনাটুকু হয়তো সামান্যই। শুধু সঙ্গতির জন্যই ইন্দিরার এই সজ্জা, তবুও জয়ন্তর কাছে যেন এসব অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর শোফারের অসুখ—সেই সংবাদে ইন্দিরার হৃদয়হীনতা, আজকেই শোফারের অসুস্থতা তার কাছে অর্থহীন। আত্ম-পরায়ণ মর্য্যাদার প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শোফারহীন কারে উৎসবে উপস্থিতি ইন্দিরার কাছে অসম্মান-জনক অসম্পূর্ণতা। মর্য্যাদার সুবর্ণদ্যুতি যেন সহসা মলিন হয়ে গেল।

এই নির্ম্মম নির্দ্দয়তাকে জয়ন্ত, ক্ষমা-সুন্দর চোখে গ্রহণ করতে পার্‌লো না। আভিজাত্য এখনও তার অন্তরে নির্দ্দয় দন্ত বসাতে পারেনি। জয়ন্তর কর্ম্মচারীরা আজো তাই তার কাছে মানুষ।

ডিসেম্বরের রাত্রি—ফাঁকা রাস্তায় শীতের তীক্ষ্ণতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে, কারের গতিদ্রুত, উইণ্ড স্ক্রীনগুলি বন্ধ, ইন্দিরার গায়ে

ফার-ট্রিমড্ ওভারকোট, তা সত্ত্বেও শীতের নির্ম্মম স্পর্শে ইন্দিরা সঙ্কুচিত হচ্ছে। ষ্টিয়ারিং-এ হাত রেখে জয়ন্ত ওর দিকে একবার চেয়ে দেখলো, আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে বুঝে ইন্দিরার মুখের কাঠিন্য ক্রমশঃই অন্তর্হিত হয়ে আসছে। আবার মুখে ফিরে এসেছে সেই স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য যা ইন্দিরার নিজস্ব। সুন্দরী ইন্দিরা, বিজয়িনী ইন্দিরা আবার একটি উৎসবের মক্ষিরাণী, ওকে ঘিরে আবার উঠবে মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি, ইন্দিরার কণ্ঠনিসৃত সুরের রেশ হল-ঘর অনুরণিত করে অভ্যাগতের অন্তর আকুল করবে। প্রাণ-চঞ্চল ইন্দিরার কণ্ঠে একটি পরিচিত সুর গুঞ্জিত হচ্ছে। ইন্দিরা ভাবছে ওকেও শীঘ্র একটি পার্টির ব্যবস্থা করতে হবে, যা লীলার পার্টিকে চাকচিক্যে ম্লান করে দিতে পারে। জয়ন্তের চিন্তাধারা কিন্তু অন্য পথে পরিচালিত—এই সব উৎসবের কৃত্রিমতা তার কাছে অসহ্য, কিন্তু নিরুপায় জয়ন্ত ইন্দিরাকে ব্যথিত করে আঘাত দিতে পারে না, তাই সহ্য করতে হয়। ইন্দিরাকে জয়ন্তর ক্রমশঃই ভালো লাগছে।

জয়ন্ত ইন্দিরার দিকে ফিরে একটু হাসলো। ইন্দিরার একমাত্র এই উৎসবপ্রীতি ভিন্ন আর কোনও অপরাধ নেই।

অকস্মাৎ পথের বাঁকে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো—গলির ভিতর থেকে অপ্রকৃতিস্থ এক মানবমূর্ত্তি সহসা হেড লাইটের জলন্ত চোখের প্রায় সামনে এসে গাড়ী থামাবার ইঙ্গিত করলো। তাকে বাঁচাবার জন্য জয়ন্ত প্রাণপণে ব্রেক করে গাড়ীর গতি মন্দীভূত করলো। অসন্তুষ্ট ইন্দিরা বিস্মিত বিরক্ত নয়নে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলো। গাড়ী

সম্পূর্ণ থাম্‌তে থাম্‌তে ইন্দিরা বল্লে—থাম্‌লে যে, পাশ কাটিয়ে চালাতে পারলে না, পাগল বোধ হয়।

জয়ন্ত উইণ্ড-স্ক্রীন সরিয়ে দিতে আগন্তুক গাড়ীর ভেতর মাথা গলিয়ে দিলো। আগন্তুক যুবক, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে তার সুশ্রী মুখখানি ক্লান্ত, ব্যবহার ও পোষাকে ভদ্র বলেই মনে হয় এবং আকৃতিতে বিশেষ বিপন্ন তা সহজেই বোঝা যায়।

তিনি বল্লেন—আমায় মাপ করবেন, কিন্তু বিশেষ বিপদে পড়েই আপনাকে বাধা দিয়েছি। আমি ডাক্তার, একটা আর্জ্জেণ্ট কলে যাচ্ছিলাম, কি বিপদ দেখুন—এইখানে এসেই আমার গাড়ী অচল হয়েছে, অথচ আমার যাওয়ার ওপর একটি শিশুর জীবন-মরণ নির্ভর করছে, যথা সময়ে না গেলে তার অবস্থা নিশ্চয়ই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বে, অথচ আমাদের গাড়ী নড়ছে না। দয়া করে যদি আপনার গাড়ীটা দেন ত বিশেষ উপকার হয়, জীবন-মরণের ব্যাপার না হলে আমি আপনাকে বিরক্ত করতাম না, আমার প্রাকটিস বেশী দিনের নয়, প্রথমেই অকৃতকার্য্য হলে আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা ছেলেটীর জীবন-মরণ আমার ওপর নির্ভর করছে, তাই আমি আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী।

বক্তব্য শেষ হোল—উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় যুবকটি কম্পমান, কিন্তু নিষ্প্রাণ গলায় ইন্দিরা বল্লে—দেখুন আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আমরা বিশেষভাবে ব্যস্ত আছি এবং ইতিমধ্যেই আমাদের দেরী হ'য়ে গেছে, সত্যি আমরা গভীরভাবে দুঃখিত যে—

"কিন্তু—" ডাক্তারটির কম্পমান স্বর ভেসে এলো—"আমাকে সেখানে যেতেই হ'বে, আধঘণ্টা, মাত্র আধঘণ্টা আপনারা দয়া করে

অপেক্ষা করুন, না হয় আপনারাই অনুগ্রহ কোরে আমাকে পৌঁছে দিন, আসবার সময় আমি হেঁটেই আস্‌তে পারবো।"

"আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে তা' অসম্ভব, তবে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে আপনাকে কার পাঠাতে পারি, তাতে যদি আপনার হয়—কিন্তু আমরা—"

"—আপনি ভেতরে আস্থন।"—ইন্দিরাকে স্তম্ভিত কোরে নিষ্কম্প গলায় জয়ন্ত বলে উঠলো—"আমি আপনাকে পৌঁছে দেব, কোথায় যেতে হ'বে বলুন।"

"জয়, তুমি তা' করতে পার না, তা' সম্পূর্ণ অসম্ভব।" ফুটবোর্ড থেকে ডাক্তারকে স্বহস্তে প্রায় সরিয়ে দিয়ে ইন্দিরা উত্তেজিত স্বরে বল্লে "—সম্পূর্ণ অসম্ভব, আমাকে এখনি নিয়ে চল, না হয় আমি এখানেই থাক্‌বো, এখান থেকে নড়বো না।"

ইন্দিরা নেমে আসবার জন্য প্রায় প্রস্তুত, কিন্তু জয়ন্তর ব্যবহার তাকে আশ্চর্য্যান্বিত কর্‌লে।

"তা' হয় না ইন্দু, জীবনমরণের ব্যাপার কি আমাদের এই উৎসব রজনীর চেয়ে বড়ো নয়, উৎসবের জন্য কি ছেলেটি মারা যাবার উপক্রম কর্‌বে, ঈশ্বর করুন তা যেন না হয়, আস্থন ডাক্তারবাবু আপনি ভেতরে আস্থন—" শান্তস্বরে জয়ন্ত বল্লে।

ইন্দিরা জানে এ পর্য্যন্ত জয়ন্তর কাছে তার সকল জেদই বরাবর বজায় রয়ে গেছে, আজও ইন্দিরা সেই আশা করলো, কিন্তু ওর পরম নিশ্চিন্ততা অচিরেই হিমেল হাওয়ায় নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল।

"আপনি কার নিয়ে চলে যান, আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা কর্‌বো"—জয়ন্ত রাস্তায় নেমে এসে ইন্দিরার পাশে দাঁড়ালো।

"আপনি সত্যি বল্‌ছেন!" কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দে অভিভূত হ'য়ে ডাক্তার বল্‌লে,—"কিন্তু আপনার স্ত্রীর ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

"আপনি চলে যান, শুধু শিশুটির কথাই আপনি বর্ত্তমানে চিন্তা করুন। আমরা ঠিক আছি।"

"আপনি—! আপনার মতো লোক জগতে আছে এই অভিজ্ঞতা আমার নূতন হোল।" আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ডাক্তার বল্লে—"ঐ রাস্তাটির উপর আমার গাড়ী রয়েছে, চলুন—আপনারা এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আস্‌ছি।"

ডাক্তার দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়ী থেকে সার্জারী ব্যাগ নিয়ে এলো, পরিত্যক্ত গাড়ীটিতে আশ্রয় নেবার জন্য ওদের অনুরোধ করলে—তারপর নিঃশব্দে ময়ূরপঙ্খী বজরার মতো জয়ন্তর বিশাল মোটরখানি অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

"ভেতরে এসো।"

বর্ত্তমান অবস্থা বুঝে, বিশেষতঃ ইন্দিরার চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করে জয়ন্তর সাহস কমে এসেছে, পরিত্যক্ত কারটিতে প্রবেশ করতে করতে তাই সে ইন্দিরাকে আহ্বান করলে। জয়ন্তর প্রসারিত হাত উপেক্ষা ক'রে নির্ব্বাক ইন্দিরা কারে উঠে এলো।

নিরীহকণ্ঠে জয়ন্ত বলে চলে—"আমি বোধহয় একে চালাতে পারবো।" অন্ধকারে হাতড়িয়ে বনেট্‌ খুলে, এঞ্জিন নাড়াচাড়া কোরে

সে বুঝলো গাড়ীটি অত্যন্ত পুরানো, তারপর আলো জ্বাল্‌তে গিয়ে দেখলে ব্যাটারী নিঃশেষিত, বহু প্রকারের চেষ্টার পর সম্পূর্ণ নিষ্ফল হ'য়ে অগত্যা সে ইন্দিরার পাশে এসে বস্‌লো। ক্যানভাসের হুডের মধ্য দিয়ে শীতের মৃত্যুশীতল বাতাস দেহে কম্পন তুলছে, হুডের মধ্যে একটি ছিদ্র দিয়ে ফোয়ারার মতো বাতাস প্রবেশ করছে এবং উইণ্ড-স্ক্রীনগুলিও কর্ম্মক্ষম নয়।

দুর্ব্বলচিত্ত লোকে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে, তার কাছে যেমন অনুনয়ের ভঙ্গীতে কথা বলে, সেই ভাবে জয়ন্ত বল্লে—"ভদ্রলোক আধঘণ্টার মধ্যে আসবে বল্লে, দেখতে দেখতে আধঘণ্টা কেটে যাবে কি বলো?

ইন্দিরা নিস্তব্ধ।

"লক্ষ্মীটি ইন্দু রাগ কোরো না"—মার্জ্জনাপ্রয়াসী জয়ন্ত বলে চলে—"বুঝতেই ত পারছ একটি ছেলের জীবন আমরা যদি দিতে পারি অনায়াসে, তাহলে আমাদের পার্টিতে যাওয়া অপেক্ষা সেটা অধিকতর তৃপ্তিপ্রদ, আমরা যদি যেতুম, তবে তা' কখনই মনুষ্যত্বের দিক থেকে ক্ষমা করা যেত না।"

নিশ্চল ইন্দিরার, দোকানের সুসজ্জিতা ডামির মতো নিস্তব্ধ ইন্দিরার মুখের মেঘমলিনতা দূর হ'ল না।

"তোমার কি খুব শীত করছে! তুমি আমার শালটা নাও"—শাল খুলে জয়ন্ত ইন্দিরার হাতে দিতে গেলে ইন্দিরা সজোরে হাত সরিয়ে দিলে। ইন্দিরার গায়ে শাল জড়িয়ে দিলে জয়ন্ত, নির্ব্বাক ইন্দিরা দেহ থেকে শাল সরিয়ে ফেলে দিলে।

জয়ন্তর পক্ষে মেজাজ শান্ত রাখা ক্রমেই দুরূহ হ'য়ে আস্‌ছে। "ইন্দু

তুমি ত অবুঝ নও, ভেবে দেখ লীলার পার্টি আর একটা ছেলের জীবনের মূল্য—এই দুটোর মধ্যে প্রভেদ কোথায়। লীলাকে এই ঘটনাটি বল্লেই তিনি সব বুঝতে পারবেন, এক্ষেত্রে লীলাও হয়তো এইরকমই করতেন। ভাল ক'রে বিচার করে কথা বল ইন্দু। কি হয়েছে, তুমি কি বলতে চাও”—

জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে এখনো উত্তাপের আভাষ নেই। কিন্তু জয়ন্তকে বাধা দিয়ে ইন্দু উত্তেজিত হয়ে বল্লে—“চুপ কর, আমার জীবনটা তুমিই নষ্ট করেছ।”

“তোমার মন আজ ঠিক নেই, তুমি প্রকৃতিস্থ নও।”

“আমি তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবো না, কখনোই নয়।”

“আর তোমার কথা যদি মেনে নিতুম তবে আমি তোমাকেও কখনোই ক্ষমা করতুম না।”

“তাই নাকি? এখন তোমায় আমি চিন্তে পেরেছি, তোমার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হ'চ্ছে, অন্যলোকের কাছে তুমি আমাকে নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন করলে। এই শীতে তুমি আমাকে এক্সপোজারে রেখেছ, পার্টিতে না যাওয়াই ছিল তোমার মুখ্য উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য তুমি সফল করলে, সুতরাং ছেলেটির মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে আর কিছু না বলাই তোমার পক্ষে শোভন।”

জয়ন্ত স্তম্ভিত, সহসা দুঃসহ ক্রোধে সে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—“ইন্দু, আমি বিশ্বাস করতে পারতুম না তুমি এত স্বার্থপর, এত নির্ম্মম, তুমি কি ছেলেটিকে হত্যা করতে চাও? কি বিশ্রী জঘন্য তোমার মনোবৃত্তি!”

এককোণে ইন্দিরা সরে বস্‌লো নীচু হ'য়ে, যেন জয়ন্ত তাকে আঘাত

করেছে, কিন্তু জয়ন্ত তাকে সত্যই মর্ম্মান্তিক আঘাত দিয়েছে। ইন্দিরার চোখে অশ্রুর প্লাবন নেমে এলো—ইন্দিরা আজ অপমানিত, শীতে কাতর, তার ইচ্ছা প্রতিহত হয়েছে এবং অবশেষে হত্যার অপবাদ, তা'ও জয়ন্তর কাছ থেকে, আর সব চেয়ে বড় কথা—পার্টিতে তার যাওয়া হোল না। ইন্দিরা রুদ্ধ ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো।

জয়ন্ত শুনলে তার ক্রন্দনের মৃদু গুঞ্জন, বিজয়গর্ব্বে তার অন্তর ক্রূর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল। সহসা তার মনে হোল, ইন্দিরা তার ক্ষমতাধীন—সে ইন্দিরার নয়, ওর আরো আঘাত প্রয়োজন।

"—মনে কর ও যদি আমাদের সুশান্ত হ'ত, আমাদের সুশান্ত! একবার কল্পনা কর ইন্দিরা সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত।" ইন্দিরাকে আঘাত দিয়ে জয়ন্ত এই কথা বল্লে।

ক্রন্দনের আবেগে ইন্দিরার সুকুমার তনু পরম নমনীয়তায় ভেঙ্গে পড়লো, জয়ন্ত নির্দ্দয় হয়েছে, সহানুভূতির লেশমাত্র ওর মনে নেই। বহুক্ষণ উভয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো। ইন্দিরার এখন মনে হচ্ছিল তারা যে না গিয়ে ছেলেটিকে বাঁচাতে সাহায্য করেছে, সে একপক্ষে ভালোই হয়েছে। কল্পনায় সে ছেলেটির সঙ্গে সুশান্তর স্থান পরিবর্ত্তন করলে, ভেবে দেখলে যদি কোনো নারী ডাক্তারকে তার রুগ্ন সন্তানের কাছে আস্‌তে বাধা দিত, তার প্রাণের কোন মূল্য দিতেই ইন্দিরা পারতোনা। সুসভ্য ইন্দিরা স্বহস্তে সেই নারীর প্রাণ নিতে কাতর হ'বে না। আর ও নিজেই কি না সেই ঘৃণিত কাজ করতে যাচ্ছিল লজ্জায় তার কপোল উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলো। ঘৃণায় ও বিভীষিকায় তার মন মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। কি করেছে সে, ক্ষণিকের উত্তেজনার জন্য সে নিজে সন্তানের জননী হ'য়ে অপর একটি সন্তানের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে পড়েছে,

আর সেই অপবাদ, সেই অপমান আর অনুশোচনার হাত থেকে তার ভুলের যবনিকা সরিয়ে তাকে আজ রক্ষা করেছে তারই স্বামী, সে আজ তাকে দিয়েছে পরম প্রশান্তি আর সে এখনো কি না সেই স্বামীকেই অবহেলা করে রইলো। জয়ন্তকে ইন্দিরা ভালবাসে, তার মনে কিছুক্ষণপূর্ব্বে যে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে জয়ন্তর প্রতি বিরূপ ক'রে তুলেছিল—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই ঘৃণা, তার পরিবর্ত্তে এসেছে পরম নির্ভরতা। জয়ন্ত আজ ইন্দিরাকে ভালবাসুক, জয়ন্ত যেন না ঘৃণা করে, বিভীষিকাময়ী নারী বলে যেন জয়ন্ত ইন্দিরাকে সত্যি পরিহার না করে; জয়ন্তর মন থেকে বিতাড়িত ইন্দিরার জীবনে প্রয়োজন নেই, নেই ওর পৃথক সত্তা, ইন্দিরা এখন জয়ন্তর স্নেহের জন্য লালায়িত, জয়ন্তর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় তার কাম্য জয়ন্তর শান্ত হাসি অভিষিক্ত করুক ইন্দিরাকে, ওর অন্তরের কোমলতা পরিস্ফুট হোক জয়ন্তর চোখে।

এই অবস্থায়, একটি ঘণ্টা চলে গেল ডাক্তার ফিরে এলো না। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে শীতের তীক্ষ্ণতা আবরণের মধ্য দিয়ে দেহে প্রবেশ করছে, অল্প ক্ষুধা বোধ হ'চ্ছে, পার্টি এতক্ষণ আরম্ভ হ'য়ে গেছে নিশ্চয়, তাদের আসন অপূর্ণ রইল এবং আর সব চেয়ে দুঃখের কথা তাদের এই আকস্মিক অনুপস্থিতির কারণ লীলাদের জানানো গেল না, কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা ক্ষণিক আনন্দের পরিবর্ত্তে একটি শিশুর জীবন রক্ষা করা গেল। এই চিন্তাই জয়ন্তর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধীরে ধীরে সময় অতিবাহিত হচ্ছে, উন্মুক্ত আবহাওয়ায় শীত-জর্জ্জর প্রখর পৌষের শীতল বাতাসের স্পর্শ ইন্দিরার জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা। কারখানি কিন্তু এখনও ফিরলো না।

ইন্দিরা অস্ফুটকণ্ঠে বল্লে—জীবনে কখনও এত শীত ভোগ করিনি!

সস্নেহে জয়ন্ত বল্‌লো—সরে এস আমার কাছে, শালটা ভাগ করে নেওয়া যাক্, তাহলে দুজনেই গরমে থাক্‌বো, নতুবা দুজনেরই নিউ-মোনিয়া হওয়া বিচিত্র নয়।

তার কণ্ঠে সন্ধির আভাষ; ওষ্ঠে মৃদু হাসি।

জয়ন্তর মনে একটু করে অনুতাপ জাগছে, দুর্ব্বলতা আবার তাকে অধিকার কর্‌ছে, এই কঠিন কঠোর কথাগুলি ইন্দিরাকে না বল্লেই পার্‌তো, কি করেই বা বল্লে। ইন্দিরার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌তে সে প্রস্তুত কিন্তু অন্তরের সমর্থন নেই, দোটানায় পড়ে সে বিব্রত।

আরো দীর্ঘকাল কাটলো সেই নির্জ্জন প্রান্তরে—কারের চিহ্নমাত্র নেই, সহসা ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়্‌লো—“আমার মরাই ভালো, বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা অসহ্য।”

জয়ন্ত উচ্চকিত হয়ে উঠলো, ইন্দিরার স্বর নূতন শোনাচ্ছে, পূর্ব্বের মতো নয়, কণ্ঠে তার হতাশা আর লজ্জার স্বর। নম্রভাবে জয়ন্ত বল্‌লো—নির্ব্বোধের মতো মৃত্যু কামনা করো না আমার কাছ সরে এস। শীত আমারও একটু কর্‌ছে।

—আমার স্পর্শে আরো বেশী শীত কর্‌বে তোমার! ইন্দিরার গুঞ্জন শোনা গেল।

“—কি বাজে বক্‌ছ?”

"—তুমিই তো বল্লে আমি নির্ম্মম, পাথরের মতো কঠিন আমার হৃদয়।"

বিস্ময়ে জয়ন্ত রুদ্ধবাক্‌।

—আমি ত' বলেছি মৃত্যুই আমার পরম কাম্য—ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে ইন্দিরা বল্‌লো। জয়ন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। ইন্দিরার কাছে জয়ন্ত সরে বস্‌লো তার কালো চুলের মদির গন্ধ জয়ন্ত'র মনে মোহ-সঞ্চার কর্‌লো। সুসজ্জিতা ইন্দিরা আর এখনকার ইন্দিরায় অনেক প্রভেদ—

ইন্দিরা ব্যাকুলকণ্ঠে বল্লো—ছুঁয়োনা আমাকে, আমি হত্যাকারী, তোমার হাত কলুষিত হবে।

জয়ন্ত হাসবার চেষ্টা কর্‌লো কিন্তু তারও শীত কর্‌ছে। জয়ন্ত ধীরে ধীরে ইন্দিরার মুখে সোহাগচিহ্ন অঙ্কিত কর্‌লো—বল্লো একটু চা বা কাফি পেলে হতো। এতক্ষণে ইন্দিরা মৃদু হেসে তার সস্মিত সমর্থন জানালো।

তার উত্তরে জয়ন্ত ইন্দিরার নরম সাদা হাত ঈষৎ পেষণ করে বল্‌লো—তুমিতো নিষ্ঠুর নও। শুধু বোঝোনি কি কর্‌ছো!

বিজয়ী জয়ন্ত। দৃঢ়চিত্ত জয়ন্ত কিন্তু তার জয়ের উল্লাস প্রকাশ কর্‌লো না। জয়ন্ত অবুঝ নয়, বিচারশক্তি তার অপ্রতুল নয়, এতদিন পরে ইন্দিরাকে সে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লো। কিন্তু ইন্দিরার প্রতি তারও একটু অবিচার করা হয়েছে, সে কঠোরভাবে তাকে রূঢ় আঘাত করেছে।

জয়ন্ত বল্‌লো—একদা আমিও ডাক্তার ছিলুম, প্রাকটিস বন্ধ করে জীবন আমার কাছে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে—তোমাদের আত্মসম্মানে বাধে। অথচ প্রাকটিস কর্‌লে নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ বলে মনে হয়।

ইন্দিরা শান্তভাবে বল্লে—এখন কি নিজেকে সম্পূর্ণ মানুষ বলে মনে হয় না, আমার কথামত চললে যদি তোমার কষ্ট হয়, তুমি যা ভাল লাগে কোরো।

ইন্দ্রজাল! কি আশ্চর্য্য, ইন্দ্রজাল ঘটছে নাকি, জয়ন্ত বিস্মিত হোল মনে মনে—হয়তো আগামী প্রভাতেই সে পূর্ব্ব স্বভাব ফিরে পাবে।

জয়ন্ত'র কোলে লীলায়িত মাথা রেখে ইন্দিরা বল্লো—আর আমি তোমাকে বাধা দেব না, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

—ক্ষমা! ক্ষমা করার কিছু নেই, যা হয়ে গেছে সেইটে বড়ো নয়, যা পেলে সেইটেই বেশী। জয়ন্ত আশ্বাস দিল।

ক্ষণিকের স্তব্ধতা, আবার অন্ধকারে ইন্দিরার স্বাভাবিক সহজ শান্ত স্বর ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো—আমি কি ভাবছি জানো, ডাক্তারটি হয়ত একটি চতুর চোর, শুধু সার্জ্জারী ব্যাগ আছে। গাড়ী আজ আর ফিরে পাবে না।

জয়ন্ত ভাবছিলো, নিরুপদ্রব আবহাওয়া ফিরে আসছে কিন্তু এই কথায় সে বিচলিত হোল। তবু বললো, পাগল, তাও কি হয়।

—তাই হয়েছে, পার্টির কথা ছেড়ে দাও, এখন একটা ট্যাক্সি পেলে বাড়ী ফিরি। আমার বোধ হয়, রাত একটা হয়ে গেছে। ট্যাক্সি কি ছাই এই পথে পাওয়া যাবে, তবু এখন থেকে হাঁটতে সুরু করলে ভোর নাগাদ বাড়ী ফেরা যাবে।

—পায়ে হেঁটে এতদূর কি যাওয়া যায়। যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে, ট্যাক্সি পাওয়া যাবেই।

আরো কিছুক্ষণ কাট্‌লো, জয়ন্ত'র ঘড়ির কাঁটা ক্রমশঃই দুটোর দিকে এগিয়ে চলেছে, অগত্যা ইন্দিরার প্রস্তাব সমর্থন করে সে রাস্তায়

নেমে পড়লো। ওভারকোটের কলার উল্টে দিল ইন্দিরা, জয়ন্ত তার শালের অর্দ্ধেক ইন্দিরার দেহে জড়ালো বাকীটা নিজের দেহে জড়িয়ে নিলে। উচ্ছ্বসিত জয়ন্ত বল্লে—আজকের রাত্রি শেষ, আবার নতুন করে প্রভাত হচ্ছে—

ইন্দিরা কলধ্বনি করে হেসে উঠলো—যেন জলতরঙ্গের পর্দ্দায় কে সহসা হাত বুলিয়ে দিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে শুধু বললো—ছেলেটা বেঁচে যাবে বোধ হয়।

—ছেলেই নেই এর ভেতর, বিশ্বাস করো। ইন্দিরার আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়।

এমন সময় ঈশ্বরপ্রেরিত একটি পরম ইপ্সিত চলমান ট্যাক্সি সেই পথে দেখা গেল। জয়ন্ত ও ইন্দিরা ট্যাক্সিতে আশ্রয় নিল।

নির্জ্জন প্রান্তরের কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত্তের বিনিময়ে উদ্ধত, দুর্ব্বিনীত ইন্দিরার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে, ইন্দিরা আজ চিরন্তনী নারীর মতোই পারিবারিক জীবনে আত্ম নিমজ্জিত করেছে।

গাড়ীটির কিন্তু আজও সন্ধান হয়নি।

রজনীগন্ধা

আর্শীর সাম্‌নে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে সুব্রত চুপ করে বসে আছে। অজ্ঞাতসারে এক হাতে তোয়ালে ঘষ্‌চে মুখে ও অন্যহাতে কোল্ড-ক্রীম্‌ মেখে মেক্‌-আপ্‌ তুল্‌ছে। গুন্‌ গুন্‌ করে একটি পরিচিত সুরের আওয়াজ সুব্রতের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে।

আজ তার অভিনয় ভালো হয়েছে। দর্শকদলের খুসীর ইসারা বহুবার সে পেয়েছে। দর্শকের হাততালির মূল্য অভিনেতার কাছে কম নয়, বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মতো এ-অভিনন্দন কখনও মৃদু, কখনও বা আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বইখানিই কি ছাই ভালো যে অভিনয় ভালো হবে, নাট্যকার পুলিস কোর্টের উকিলবাবু কিন্তু নিজেকে একজন সেক্‌স্‌পীয়র মনে কর্‌চেন। বই যে তিনমাস চল্‌চে তার একমাত্র কারণ সুব্রতের সু-অভিনয়। এ ধারণা সুব্রতের একার নয়, যে কোনও পয়সা সপ্তাহিকের পাতায় এই মতের প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যাবে।

আজ ম্যাটিনীর সাফল্যে সুব্রত আত্মহারা, সারা দেহে তার খুসীর উত্তেজনা উপ্‌চে পড়চে।

হতাশার শেষ-মুহূর্ত্তে এসেছে সাফল্য।

আর্শীতে সুব্রতের হাসির ছায়া পড়ছে, সুব্রত আজ নিজের হাসিটিও লক্ষ্য কর্‌চে। সত্যই ত, তার হাসির মূল্য কি কম? এ ধরণের হাসি আর কার মুখে ফুটবে? এ হাসি ওর নিজস্ব।

সুব্রত আজও সুদর্শন। বত্রিশের একদিনও বেশী তাকে দেখাচ্চে না, (আসল বয়স অবশ্য অনেক বেশী)—আর পাদ-প্রদীপের সামনে সে বাইশ বছরের নব্য যুবক। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক পরিচর্য্যায় সে শরীরে শক্তি ও কমনীয়তা রক্ষা করেচে। তার দেহ নিখুঁত,তার সুগঠিত দেহে আর কেউ খুসী যদি না-ই হয়, দর্জ্জিরা আশীর্ব্বাদ করে।

একটা হাত আয়না ড্রেসিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সুব্রত আলোর দিকে এগিয়ে এল, বোধ হয় চোখের কোণে একটু কুঞ্চিত রেখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গ্রীজ পেণ্টের শক্তির কাছে তাকে হার মান্‌তে হবে। তা ছাড়া চৌরঙ্গীর সেলুনে বিদেশিনীর হাতের মাসাজ—

সুব্রতর হাসি গম্ভীর হয়ে এলো, মুখের ওপর কোমল করাঙ্গুলির স্পর্শ, তার নিঃশ্বাসের তপ্ত সুগন্ধ, চোখের চাঞ্চল্য, সহসা যেন ছবির মতো ভেসে উঠলো মেয়েটার নাম বুঝি মার্জ্জারী, আর একদিন ওদের সেলুনে যেতে হবে, শনিবারের ম্যাটিনীর আগে একবার যেতেই হবে।

চুলগুলি আরএকবার ব্রাস্ কর্‌তে হঠাৎ চোখে পড়লো কতকগুলি শাদা চুল, সযত্নে কলপ দিয়ে তাদের ঢাকতে হোল। এখন সুব্রতের সুবিন্যস্ত কেশের দিকে বিধাতারও চেয়ে থাক্‌বার বাসনা হয়।

কে তার আসল বয়স জানে ? আজও সুব্রতর নাম বক্স অফিসের আকর্ষণ, মেয়েরা এখনও তার প্রেমে পড়ে। সহসা সুব্রতের চোখে পড়লো চিনে মাটির ফুলদানিতে সজ্জিত রজনীগন্ধার শুভ্র সৌন্দর্য্য। তুষার বর্ণা রজনীগন্ধা নিরাভরণা পল্লীবধূর মতো নতমুখী, শুভ্রতা আর শুচিতার প্রতীক। আভিজাত্যের গর্ব্ব তার অল্প নয়।

সুব্রতের গর্ব্বের বেদীতে ফুলগুলি যেন অর্ঘ্য। ওদিকে চোখ পড়লেই, সূর্য্য কিরণের দীপ্ত তেজের মতো সুব্রতের মুহ্যমান শক্তি

দীপ্যমান হয়ে ওঠে। জেগে ওঠে তার আত্মবিশ্বাস, আর দুর্জ্জয় সাহস। একটি রজনীগন্ধা সুব্রত বাট্‌ন হোলে সাজালো। এ তার সাফল্যের প্রতীক।

আজো এ ফুলের প্রেরকের নাম তার কাছে রহস্যময়, কিছুকাল ধরে এ ফুল মাঝে মাঝে আসছে, প্রেরকের নাম নেই, বাণী নেই। সুব্রতর ধারণা এ তার অসংখ্য নারী ভক্তের অন্যতম কোনও অনুগ্রাহিকার দান। এক-দিন তাঁর সন্ধান মিল্‌বেই, এমনই হয়। সুব্রত এই ফুলগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখে এবং তাদের আবির্ভাবে সে পেয়েছে প্রচুর প্রাণশক্তি। জীবনের এক মেঘাচ্ছন্ন তিথিতে এই ফুলগুলির প্রথম আবির্ভাব, উৎসাহের অভাবে সুব্রত তখন ডুবতে বসচে, সেই সময় দর্শক সাধারণের পরিবর্ত্তনশীল মতের দোলায় তার নাম শূন্যে দুল্‌চে।

কি দিনই গিয়েছে, সুব্রত শিউরে উঠ্‌লো, সহসা যেন ঠাণ্ডা বাতাস সারা দেহে তুহিন স্পর্শ দিয়ে গেল।

সেই দুর্দ্দিনের অবসান—মুহূর্ত্তে রজনীগন্ধার আবির্ভাব। সুব্রতের জীবনের অন্ধকারে ফুলগুলি যেন কল্যাণী শুকতারা।

হাত আর্শীটা নামিয়ে রেখে সে ক্ষিপ্রগতিতে কোল্‌ড-ক্রীমের সাহায্যে মেক-আপ তুল্‌তে লাগলো। দীর্ঘকালের অভ্যস্ত ভঙ্গী।

সুব্রতর প্রথম জীবন কেটেছে ভ্রাম্যমান থিয়েটারের ক্লান্তিকর মফঃস্বল অভিনয়ের মধ্যে। কোম্পানীর কলিকাতার বাড়ীতে লাগলো আগুন, অধিকারী পুরানো অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাংলার একদা সমৃদ্ধ মফঃস্বল সহরগুলির উদ্দেশে। সেইভাবে দীর্ঘ পাঁচ বছর কাট্‌লো—পাঁচ বছর কাটলো নানা কষ্ট ও বিপদের মধ্যে। জঘন্য খাবার, কদর্য্য বাসস্থান, আর সর্ব্বদাই চোরের ও সাপের ভয়। সুব্রত সুদিনের আশায় ধৈর্য্যের সঙ্গে তা সহ্য করেছে, অবশেষে এসেছে সাফল্য।

এই পঞ্চবার্ষিকী কৃচ্ছ্রসাধনের পর সুব্রত বিবাহ কর্‌লো, তাও বিবাহ কর্‌লো ষ্টেজের তদানীন্তন একজন নামকরা শিক্ষিতা অভিনেত্রী লীলাবতী রায়কে। সুব্রত-লীলাবতীর সে পরিণয়ে তৎকালে বেশ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। বাংলায় সেই বোধ হয় প্রথম অভিনেতা-অভিনেত্রী বিবাহ।

লীলাবতী ও সুব্রত একই কোম্পানীর নট-নটী। একই তাঁবুর নীচে তাদের দীর্ঘকাল কাটাতে হয়েচে, কিন্তু সুব্রত আগে তা'কে লক্ষ্য করেনি। সেবার ইনফ্লুয়েঞ্জার সময় লীলার সেবা তাকে প্রথম আকৃষ্ট কর্‌লে।

পেশাদারী অভিনেত্রী মহলে লীলা দেববালা। মার্জ্জার শিশুর মতো শুভ্র, নরম ও ভদ্র। অভিনেত্রী অপেক্ষা নার্সের কাজে সে বেশী পটু। লীলার ছোটখাট সব কাজগুলি রোগ শয্যায় শায়িত সুব্রতর চোখে মধুর হয়ে লাগলো। লীলা কখনও বা বালিশটা বদ্‌লিয়ে দিচ্ছে; কখনও স্ক্রীন্‌টা সরিয়ে ঠাণ্ডা নিবারণ করচে, কখনও আবার ল্যাম্পের সেড্‌টি ঢেকে দিচ্ছে, সুব্রতর চোখে যাতে আলো না লাগে।

একদা এক সন্ধ্যায় গভীর নিদ্রাভঙ্গের পর সুব্রতর চোখ পড়লো ল্যাম্পের ধারে সীবনরতা লীলার ভাবনিবিষ্ট শান্ত সমাহিত ভঙ্গিমা। লীলা সুব্রতর একটা আলোয়ান রিপু কর্‌ছে। সুব্রত বিস্ময়ে মুগ্ধ

হলো। বিনা অনুরোধে কেউ কখনও তার এতটুকু উপকার করেনি। সুব্রত চুপ করে লীলার এই ভঙ্গিমা লক্ষ্য করতে লাগলো, লীলার চুলের ওপর আলোছায়ার খেলা চলেছে, গোলাপী গণ্ডে একটু আলো পড়েছে, চোখে লেগেছে ছায়া। লীলার হাত নাড়ার মনোহর ভঙ্গীটুকুও সুব্রতর ভালো লাগলো। সুব্রত-র রোগজীর্ণ ক্লান্ত মনে সহসা এলো শান্তির অসহ্য আনন্দ। সেই পরম মুহূর্ত্তে মনে জাগলো লীলাকে বিবাহ করবার বাসনা। জীর্ণ বস্ত্রের সংস্কারে সে যেমন পটু, তেমনি সুব্রত-র জীর্ণ জীবনের সংস্কারে তার শুভ্র হস্তের স্পর্শ কল্যাণকর।

আত্মীয়তার চিরন্তন বন্ধনে যে ওকে বাঁধা যাবে তা সুব্রত কোনো-দিন ভাবে নি। এমন দিনও আসবে প্রাচীরে প্রাচীরে সুব্রত-র নাম ঘন-লাল রঙের বড় বড় হরফে চারিদিকে ছড়ানো থাকবে, সিনেমাগৃহে তার নামে বিজলীবাতি জ্বলবে আর নিভবে। সে সুদিনে লীলার আন্তরিকতা ব্যক্তিগত জীবনের একমাত্র সম্পদ।

সেইবার মফঃস্বল থেকে ফিরেই ওদের বিয়ে হ'ল, আর সেই বিবাহেই ওর জীবনের সাফল্যের সূচনা।

লীলা ষ্টেজ্ ছেড়ে দিল, সুরু করলো রান্না করতে, ঘর সাজাতে, জামা-কাপড় সেলাই করতে, ফিরিওয়ালাদের সঙ্গে তর্ক করে জিনিষের দর কমাতে, আর সুব্রতকে উৎসাহ দিতে। এক কথায় লীলা হয়ে দাঁড়ালো পতিব্রতা স্বাধ্বী স্ত্রী। আর সুব্রত অল্প খরচে আগেকার চেয়ে অনেক বেশী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে লাগলো। আর একটি

বিশেষ গুণ লীলার ছিল—সে কখনও স্বামীর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি—ঈর্ষা কখনও তার মনকে স্পর্শ করেনি।

লীলাকে ষ্টেজের উপযোগী করে বিধাতা গড়েন নি, গড়েছিলেন গৃহের উপযোগী করে। আকাশের পাখীরও নীড়ের মায়া আছে।

বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই সুব্রত-র নাম চারিদিকে বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়লো। 'নাট মহলে'র সে অন্যতম প্রধান অভিনেতা হিসাবে গণ্য হোল। আর লীলা 'সদানন্দ রোডের' সুসজ্জিত ফ্ল্যাটের নির্জ্জন কক্ষে আদর্শ-গৃহিণীর শান্ত জীবন যাপন কর্‌তে লাগলো, সাধারণের ক্ষীণ স্মৃতির পর্দ্দায় লীলাবতী নাম্নী একদা প্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর নাম ক্রমশঃ মুছে গেল।

লীলা এখন একান্তভাবে তার স্বামীর। স্বামীর সাফল্যে সে গর্ব্বিত, তার আশাভঙ্গে দেয় সান্ত্বনা, তার ক্লান্তিতে দেয় শান্তি, আর রোগে করে পরিচর্য্যা। সুব্রত-র জীবনের কোলাহলে লীলা বেঁধেছে নিরালা নীড়।

যশের সিঁড়িতে অধিরোহণ করা যতটা সহজ হবে সুব্রত ভেবেছিল তা কিন্তু হোল না—অবশ্য সাফল্য এসেছিল। সুব্রত-র মতো অভিনেতার যা প্রাপ্য তার বেশীই সে পেয়েছে, সুব্রত-র সুচেহারা অবশ্য তার জন্য দায়ী। অগণ্য তার নারীভক্ত, প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি, ফুলের তোড়া, তার নানাপ্রকার ছোটখাটো উপহার তার প্রাপ্য। সুব্রত-র জীবনের সাফল্যের মূলে এই লীলা এবং সম্ভবতঃ সেকথা সুব্রত জানে।

দিন কেটে যায়, সদানন্দ রোডের ফ্ল্যাট-এ লীলা ডুবে রইলো।

ক'জনেই বা জানতো লীলাবতী জীবিত আছে—ত্রিশে তার চুলে ধর্‌লো পাক্‌, সাজ পোষাকে তার নেই বৈচিত্র্য, মুখে নেই মেক্‌-আপ। সময় সময় সুব্রত থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে এই মেয়েকে একদা সুন্দরী ভেবে কেন সে বিয়ে করেছিল। সুব্রত-র দৈনন্দিন জীবনে যে সব নারী বিচরণ করে, তাদের তুলনায় লীলা যেন রূপ-বিলাসিনী ময়ূরীর পাশে ভীরু খঞ্জনা। তবুও সুব্রত-র জীবনে লীলার প্রয়োজন কম নয়।

সুব্রত-র বয়স যখন চল্লিশ, হঠাৎ নিউমোনিয়া তাকে আক্রমণ কর্‌লো—এবং আর সকলের মতো সুব্রতও জানে যে লীলার শুশ্রূষা ভিন্ন আর কিছু তাকে বাঁচাতে পারতো না। সেই ক্লান্তিকর দীর্ঘ রোগ-শয্যায় শুয়ে সে আবিষ্কার কর্‌লো তার যৌবন সসম্ভ্রমে প্রৌঢ়ত্বকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। আর্শীতে শাদা চুল, কপালের রেখা, মুখের কুঞ্চিত কদর্য্যতা, সমস্তই ঐক্যতান করে সুব্রত-র প্রৌঢ়ত্বের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা কর্‌লো। সুব্রত, বাংলার প্রিয়দর্শন নট সুব্রত, সভয়ে এই আগমন লক্ষ্য কর্‌লো। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সুব্রত-র দম্ভে পড়লো আঘাত। আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় বনিয়াদ হোল পল্‌কা।

এক বছর কেটে গেল সম্পূর্ণভাবে সার্‌তে—কিন্তু সেরে উঠে সুব্রত বুঝলো সারার চেয়ে সরা ছিল ভালো। নাট্য-জগতের হয়েচে বিবর্ত্তন, সুব্রত সেখানে অর্দ্ধবিস্মৃত। কর্ম্মকর্ত্তারা আর তার সহযোগিতা পাবার জন্য ব্যাকুল ন'ন। গড়গড়ার নল নামিয়ে তাঁরা অসহায় দৃষ্টিতে, সমালোচকের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগলেন। যে ব্যবসার আকাশে নক্ষত্র একরাত্রে উদিত হয়েই অস্তগামী হয়, সে আকাশে সুব্রত রাহুগ্রস্ত। নাট মন্দিরের অঙ্গনে তখন নবীন নটের ভীড়।

অবশেষে কাজ একটি জুটলো কিন্তু সুব্রত-র পূর্ব্বতন ভূমিকাগুলির

চেয়ে এই ভূমিকা হোল অপেক্ষাকৃত খারাপ, কিন্তু তাতেই রাজী হ'তে হোল। উপায় নেই, আবার তাকে নতুন করে সমস্ত গড়ে তুলতে হবে

আশা ও নিরাশার সঙ্গে কিছুকাল ধরে চললো দ্বন্দ্ব—কিন্তু ক্রমশঃই যেন সে লুপ্ত হয়ে যেতে বসেচে! কাগজে কাগজে তাকে নিয়ে আর সংবাদ-বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় না, তার ফটো ছাপাবার আগ্রহ আর তাদের নেই, নারীভক্তদের পত্র হোল দুর্ল্লভ—বাইরের ঘরের ফুলহীন রুক্ষ চেহারা চোখে দেখতে পারা যায় না, তাই তাকে মাঝে মাঝে কিছু ফুল কিনতে হয়। আয়ের ঘরে বৃহস্পতি তখন আর বসে নেই এবং ভবিষ্যতের সঞ্চয় সে কখনও করেনি কাজেই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আকাশ হোল তমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু এও সহ্য হত যদি তার দম্ভে আঘাত না লাগতো, স্তাবকতা ও প্রশংসা তার জীবন ধারণের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস—আর এই থেকে বঞ্চিত থাকা আর রবিরশ্মি বিহনে উদ্ভিদের জীবন ধারণ করা একই কথা।

এই দুর্দ্দিনে ছিল লীলা,—লীলাই তাকে বাঁচিয়েছে। দিনের পর দিন সে এনেছে সাহস, দিয়েছে বিশ্বাস, আর যে প্রচেষ্টায় সুব্রত স্বয়ং পা বাড়াতো না তাতে দিয়েছে প্রেরণা। আত্ম-বিশ্বাসের দুর্ব্বল স্ফুলিঙ্গে ফুঁ দিয়ে নির্ব্বাণোন্মুখ শিখাকে অচঞ্চল করেছে, এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সৌভাগ্যস্রোত ধারা পরিবর্ত্তন করেছে।

আবার আসতে সুরু হয়েচে প্রেমপত্র ও অভিনন্দন। আবার

আস্‌চে ফুল—গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা—এবং একদা এক পরম মুহূর্ত্তে এলো আর্কিডের সঙ্গে শুভ্র তুষার বর্ণা এই রজনীগন্ধা !

এই রজনীগন্ধা তার জীবনের গতি ফিরিয়েছে। রজনীগন্ধা সুব্রতর জীবন-অমার আকাশে পূর্ণ জ্যোৎস্না। রজনী এনেছে সুরভি-সুরের সুরধনী-প্রবাহ। সুব্রত আবার বুঝলো আজ সে লুপ্ত হয় নি। আজো তার রয়েছে প্রয়োজন, আজো তার অভিনন্দন, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য, প্রেমের নৈবেদ্য, আস্‌ছে ভারে ভারে ! সুব্রত-র আহত দম্ভে এই হলো সঞ্জীবনী সুধা।

সুব্রত আবার নিজেকে শক্তিমান বলে বুঝতে পারলো, পরাজয়ের ভস্ম ধূলি হ'তে আবার ফিনিক্স উদিত হয়েছে।

সুব্রত চুলগুলো ব্রাস কর্‌তে কর্‌তে আপন মনে হেসে উঠলো এবং সেই হাসির ঐক্যতানে বাজলো টেলিফোনের সুতীব্র ঝন্‌ঝনা।

হাসতে হাসতে সুব্রত রিসিভারটি কাণে তুললো—হয়তো বীরনগরের রাণী। কিম্বা বালিগঞ্জ বাসিনী মিসেস্ রায়, মিসেস রায়ের নিমন্ত্রণ রাখা অসম্ভব—ফুরসুৎ তার নেই, যদি টাকার কুমীর না হতেন কি যে তার অবস্থা হোত—

অচেনা কণ্ঠে ব্যবসাদারী ভঙ্গীতে মেডিক্যাল কলেজের ইমার্জ্জেণ্ট ওয়ার্ড জানালো—জানালো, লীলা অকস্মাৎ বাস থেকে পড়ে ভীষণ আহত হয়েছে।

লীলা ! আহত !

রিসিভার সুব্রত-র হাত থেকে পড়ে গেল, সারা ঘরখানি যেন তার চারদিকে নৃত্য সুরু করেছে—সুব্রতর সারাদেহ সেই শীতের দিনেও স্বেদাপ্লুত হয়ে উঠ্‌লো।

লীলা! আহত!

সুব্রত একথা বিশ্বাস করে না, হয়তো ভুল কিন্তু যেতে হবে, ব্যাপারটি নিজের চোখে দেখা দরকার। সুব্রত সিঁড়ি দিয়ে উন্মাদের মতো নামতে লাগলো—তারপর—

সুব্রত কখনও মৃত্যু দেখে নাই, কিন্তু বুঝলো এই মৃত্যু, লীলা একদা সুন্দরী লীলা প্রেতের মতো বিছানায় মিশিয়ে আছে। রক্তহীন ভঙ্গুর কঙ্কাল।

সুব্রতকে দেখে লীলার মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠলো, সুব্রত বিছানার ধারে বসে শিশুর মতো কেঁদে উঠলো—বাধাহীন অশান্ত ক্রন্দন!

লীলা—মৃত্যুমুখে লীলা!

সুব্রতর মনে হলো এ দুঃস্বপ্ন! কি যে হয়েচে তা সুব্রত বুঝচে না—কিন্তু এই সত্য। নিষ্ঠুর সত্য, ভীষণ সত্য।

সুব্রত সেই শয্যা পার্শ্বে বুঝ্‌লো লীলার মুল্য—কোন দিন সে লীলার কথা ভাবেনি, কি যে তার দাম, কি তার সার্থকতা। এখন বুঝলো এই কয় বছরে লীলার জীবন তার অন্তরে মিলিয়ে গেছে। লীলার স্মৃতি অনন্ত বেদনায় অবলুপ্ত হবার নয়। এই লীলা। আজ এতকাল পরে সে তাকে ত্যাগ করলো।

লীলার দুর্ব্বল আঙ্গুল সুব্রত-র চুলগুলির ভিতর সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো, আন্তরিকতার শান্ত স্পর্শ।

সুব্রত তার মনের যন্ত্রণা লীলাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু

পার্‌লো না। সুব্রত, যে—সুব্রত কত নারীর হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, কত প্রেমিকের ভূমিকাভিনয়ে দর্শকের সপ্রশংস হাততালি পেয়েছে, সেই সুব্রত তার স্ত্রীকে জানাতে পার্‌লো না—তার শেষ কথা। তার বেদনার কথা; তার অসহ্য ব্যথার জ্বালা।

দীর্ঘকালের অবহেলা ও স্বার্থপরতার ক্ষমা সে চাইতে পার্‌লো না। মুখর সুব্রত সহসা মূক।

কিন্তু লীলা এ সব বুঝ্‌লো—সুব্রত-র চোখের জল মুছিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌লো—ছিঃ কাঁদছো কেন—কাঁদ্‌তে নেই, আমি জানি—

মৃত্যু পথযাত্রী লীলা এক দৃষ্টে সুব্রত-র ক্রন্দনাতুর মুখের দিকে চেয়ে রইলো সুদূরের যাত্রীর সেই পাথেয়।

লীলার দীর্ঘায়ত চোখ দুটি ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে এলো।

সুব্রত যখন উঠ্‌লো তখন রজনীগন্ধার শুভ্র পাপড়িগুলি বিছানার ওপর চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রভাতের আলোয় যে জীবনের বেলাভূমে এসে পড়েছিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে সে স্বপ্নের মতো চলে গেল।

যেন কোন্‌ বিদেশিনী—ছায়া।

দৃষ্টি

তিনু মাঝিকে কখনও নাকি হাসিতে দেখা যায় নাই। কদাচিৎ যখন তাহার ম্লান মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে, তখন অকারণে সবল বাহু দুটি উপরে তোলাই ছিল তাহার মুদ্রাদোষ! বহুলোককেই সে জানে, পাঠশালার ডান্‌পিটে ছেলে হইতে তাহাদের আশীবছরের পিতামহরাও তাহার অপরিচিত নহে, তাহাদের প্রতিপদক্ষেপ তাহার পরিচিত, তাহার খেয়া নৌকায় সে আজ বিশ বছর ধরিয়া যাত্রী পারাপার করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের গলার স্বর, নিঃশ্বাসের ভঙ্গী সমস্তই তাহার পরিচিত, এমন কি আগন্তুক না হইলে ওপারে যখন তাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া ডাকে, বাজাইবার ভঙ্গীতে সে বুঝিতে পারে বাদকটী কে। তাহাদের নাম, ধাম, পেশা সমস্তই তাহার জানা, অনেকের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কাহিনীও তাহার নিকট অজ্ঞাত নয়। কেন জানিবেনা, আজ বিশ বছর ধরিয়া সে এই খেয়া তরীর মাঝি। গাঁয়ের লোকের সে তিন পোয়া পথশ্রম লাঘব করিয়াছে, ইহার বিনিময়ে যে দু-চার পয়সা অর্জ্জন করে তাহাই তাহার জীবিকা।

কানা তিনু বলিয়াই তাহাকে পাশাপাশি তিনখানা গাঁয়ের লোকে জানে, তিনু অন্ধ, বাল্যাবধি সে আলোর আড়ালেই বাড়িয়া উঠিয়াছে।

অগভীর চন্দনানদীর নীচে যে-স্বচ্ছ নীলজলের মেলা তাহা সে কখনও দেখেনাই, কিন্তু তাহার কল্লোল সে বর্ষায় শুনিয়াছে, স্রোতের মুখে লগী ছাড়িয়া দিয়া বহুদিন সে উৎকর্ণ হইয়া সর্‌সর্‌ শব্দ শুনিয়া পুলকিত হইয়াছে, কোন্‌ বাঁকে লগীটি কনুই দিয়া ধীরে ঘুরাইয়া ডাঙায় লাগাইতে হয় তাহাও সে জানে। জল-কল্লোল, বাতাসের গন্ধ, মেঘের হুঙ্কার, কাল-বৈশাখীর চাঞ্চল্য, শীতের হিমেল হাওয়া লইয়াই তাহার জগৎ, এ জগৎ তাহার অতি পরিচিত। স্পর্শ, গন্ধ ও শ্রবণের সাথে সাথে কদাচিৎ সে দৃষ্টির কামনা করিয়াছে—আলোর অভাব সে খুব কমই অনুভব করে!

প্রথম যখন হৈমকে সে বিবাহ করিয়া আনিল, তখন একবার তাহার মনে হইয়াছিল, যদি দেখিতে পাইতাম, হিমুকে একবার দেখিতাম, কেমন না জানি তাহাকে দেখিতে, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া তৃপ্ত হইতাম, আঁখিতে যদি দৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে, ভালোবাসা কত সহজ হইত!

সেই একদিন সে আঁখির অভাব অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু নিজের চোখে তাহাকে না দেখিতে পাইলেও হৈমর চোখেই সে হৈমকে দেখিয়াছিল। হৈমকে নাকি চমৎকার দেখিতে, তিনুর কাছে সে তদবধি রূপ ও সৌন্দর্য্যের রাণী হইয়া আছে।

কিন্তু ইদানীং হৈম যেন কেমনতর হইয়া গিয়াছে, তাহার কথায় সে মধু নাই, ব্যবহারে সে আন্তরিকতা নাই, তিনুর উপর তাহার আর সে দরদ নাই! তিনু বুঝিতে পারেনা কেন এমন হইল, এমন দিনও গিয়াছে, হৈম সকালে তাহাকে ডিঙিতে বসাইয়া গিয়াছে, দুপুরে আমানি আনিয়াছে, আবার সন্ধ্যা না হইতেই তাহার কোমল স্পর্শ তিনু

অনুভব করিয়াছে, কিন্তু আজকাল তাহাকে একাই আসিতে হয়, কখন যে সন্ধ্যা হয় বুঝিতে পারে না, মন্দিরের শাঁখের আওয়াজে ধীরে ধীরে পারে ডিঙা ভিড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে !

খানায় পড়িয়া যাওয়া, হঠাৎ গাছে আঘাত লাগা, এমন কি কোনও মানুষের সহিত ধাক্কা লাগিলেও কিছু আসে যায় না, পথের সাথে নূতন করিয়া পরিচয় হয়। কিন্তু হৈম যখন ঝঙ্কার করিয়া উঠে, 'কানা মিনসে, মরণ হয়ত বাঁচি, এমন সোয়ামী না থাকা ভালো, বলি নদীর জলেই থাকতে পারোনা—'তখন দুঃখে অভিমানে তিনুর চোখ ভিজিয়া উঠে, কিন্তু কি ভাবিয়া সে চুপ করিয়া যায় !

তিনু ভাবে হৈমর একি হইল ? সে অন্ধ, কিন্তু যাহাদের চোখে জ্যোতি আছে তাহাদের মতোই ত' সে আহারের উপায় করিয়া আনিতেছে, সে অন্ধ, তাহার এই দৃষ্টিহীনতাই কি হৈমর রাগের কারণ, কে জানে ?

আবার ভাবে, হৈম কেনই বা রাগ করিবেনা, আহা বেচারী আর তাহাকে লইয়া পারেনা। হয়ত তাহার চোখ নাই বলিয়া কত কথা তাহাকে বলিতে পারেনা, হৈম মুখরা, হোক সে মুখরা—পৃথিবীতে সে যে একা নহে ইহাই কি তাহার কম সান্ত্বনা !

দৃষ্টি থাকিলে হয়ত মন্দ হইত না, এই কথাটাই একদিন ডিঙিতে বসিয়া চুবড়ি বুনিতে বুনিতে তাহার মনে হইল। ডিঙি বাহিবার অবসরে চুবড়ি বুনিয়া দু' পয়সা পাওয়া যাইত, আর যাহাই হউক হৈমর সাংসারিক বুদ্ধি আছে। এই পয়সা সে আপৎকালের জন্য একটি বিস্কুটের টিনের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। তিনু মাঝে মাঝে ভাবে যদি দৃষ্টি-শক্তি থাকিত তাহা হইলে সে হৈমকে লইয়া সহরের

হাটে যাইত, মকর-সংক্রান্তির দিন বাঁশখালির মেলায় যাইয়া হৈম ও সে সজীব ছবি দেখিয়া আসিত।

সহসা ওপারে ঘণ্টা বাজিল, চুবড়িটি একপাশে সরাইয়া, লগী বাহিয়া তিনু ওপারে চলিল।

পারে পৌঁছিয়া তিনু প্রশ্ন করিল—ক জনা গো?

একযোগে উত্তর আসিল—আমরা দুজন আছি হে। তিনু বলিল—ওঃ, বাবা ঠাকুর আর সরকার মশাই বুঝি! একটু সামলে আস্‌বেন ওখানটায় আবার ভোরের পশলাটায় জল জমেচে!

স্বামিজী চারটি পয়সা পেরুণী দিয়া কহিলেন—ভালো আছো তিনু?

তাঁহার পদধূলি লইয়া তিনু মৃদু হাসিল মাত্র! সরকার মশাই কহিলেন—আমি জমিদারী কাজে এসেচি, বুঝলে হে!

এবারও মৃদু হাসিয়া তিনু জানাইল সে বুঝিয়াছে।

ডিঙি চলিতে লাগিল।

স্বামিজী সহসা দেখিলেন সরকার অদূরে যেন কাহাকে কি ঈঙ্গিত করিতেছে। তাহার দৃষ্টিপথ লক্ষ্য করিয়া দেখা গেল অদূরে এক কুটীরের দিকে সরকার চাহিয়া আছে, আর বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া এক সুশ্রী রমণী! স্বামিজীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, রমণী বোধকরি তাঁহার পরিচিত!

চুপ করিয়া থাকিতে স্বামিজীর ভালো লাগিল না—কৃত্রিম উদ্বেগের সুরে প্রশ্ন করিলেন—ডিঙা বেশ মজবুত আছে ত' হে তিনু? কতকাল হাত পড়েনি!

তিনু কহিল—আজ্ঞে, সরকার মশাই সেদিন বল্‌ছিলেন জমীদারবাবু নাকি একটা নতুন ডিঙি গাঁয়ের লোকদের জন্যে দেবেন, গরীব দুঃখীর

ওপর তাঁর নাকি বড় দয়া! সরকার তাড়াতাড়ি বলিল—তোমার কথা তাঁর কানে গেছে হে তিনকড়ি, এ মাসেই হোত, তা পল্‌তাবেড়ের জমীটা এবার খরিদ হলো কিনা, আস্‌চে মাসেই যাতে হয় আমি স্বয়ং তার ব্যবস্থা করবো, এ হ'ল পাঁচজনের উপকার! স্বামিজী এবার নূতন কথার প্রয়োজন অনুভব করিয়া প্রশ্ন করিলেন—আচ্ছা তিনু নন্দ কামার সেই যে গঙ্গাসাগরে গিছলো, ফির্‌লো কিনা কিছু জানো?

—তা জানেন না বুঝি? এবার গঙ্গাসাগরে গিয়ে সে মহাপুন্নি করে' এসেচে, ওদের নৌকো বুঝি ডুবে যায়, তা, ও নিজে ত' কোন গতিকে বেঁচেছে আবার ভূতো কলুর ছোট ছেলেটাকেও উদ্ধার করেচে। ভূতোর মা টা, টেঁসে গিয়েছে, তা সে বুড়ো মানুষ গঙ্গালাভ করেচে, কিন্তু মশাই ছোকরার জীবনটা ত' আর তুচ্ছ নয়! সারা গাঁয়ে ধন্নি ধন্নি পড়ে গেছে—। এতগুলি কথা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া সরকার থামিল!

তিনু বিস্মিত হইয়া বলিল—বলেন কি? আমরা ত' শুনেচি গঙ্গাসাগরে গেলে সশরীরে ফেরাই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, তা ভূতনাথের সেই ছেলেকে আবার বাঁচিয়েছে? তাজ্জব কাণ্ড!

সরকার মুরুব্বিয়ানা চালে কহিলেন—এতবড় ব্যাপারটা সবাই শুন্‌লে হে, আর তিনু তোমার কানে পৌছায় নি! স্বামিজী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন এইবার বলিলেন—সবই সম্ভব হে, সবই সম্ভব! তাঁর দয়া হে তিনকড়ি! মানুষ যতক্ষণ না হাতে-নাতে ফল পায় ততক্ষণ বিশ্বাস করে না। নন্দ তোমাদের পরিচিত তাই, নইলে এ ত' গল্প কথা হ'য়ে দাঁড়াত। তবু তাঁকে মনুষ ডাকেনা। বিধাতার ইচ্ছে বুঝলে তিনকড়ি! গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনকড়ি কহিল—আজ্ঞে

তাঁর ইচ্ছে বই কি, এই দেখুন না চোখ নেই বলে কি আমার কাজ আটকাচ্চে, আজ বিশবছর এই কাজ কর্‌চি, কোনো গোল হয় নি।

স্বামিজী সহসা বলিয়া ফেলিলেন—আচ্ছা তুমি যদি আজ থেকে দেখ্‌তে পাও তিনু—তাহলে কেমন হয়? তিনু আবার মৃদু হাসিল! অন্ধকারে সে যেন কি দেখিতে পাইতেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার তাহার দিকে কঠোরভাবে চাহিয়া আছে। তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তিনু চোখ খুলিতে পারিতেছে না। তিনু সভয়ে জ্যোতিহীন চোখের পাতা বন্ধ করিল!

ডিঙা প্রায় পারে আসিয়া পড়িয়াছে! স্বামিজী আবার প্রশ্ন করিলেন—তোমার আশপাশে কি আছে না আছে, তোমার কি দেখতে ইচ্ছে করে না তিনকড়ি, এই যেমন আমরা দেখ্‌তে পাই।

এইবার তিনকড়ি আর নির্ব্বাক রহিল না, আক্ষেপের সুরে কহিল, আপনাদের মুখেই শুনেচি, আমাদের দেহ হোল ভগবানের দান, তা তিনিই যখন দেন্‌নি বাবাঠাকুর! তখন মিছে কেন ওর জন্যে ভেবে মরি!

সরকার মশাই এতক্ষণ কেন জানি না তিনুর দৃষ্টি-হীন চোখের উপর সভয়ে চাহিয়াছিলেন, এইবার কথায় কৃত্রিমতা মিশাইয়া বলিলেন চোখ কি জিনিষ তাই ও জানেনা, আর ওর কিসের অভাব বলুন না, চোখ ওর থেকেও যা না থেকেও তাই—কি বলো হে!

ডিঙা পারে লাগিল।

স্বামিজী তিনুর হাতে আর একটা আনি দিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন।

সরকার মশাই সেই ভাবেই বলিতে লাগিলেন বুঝ্‌লে হে, হুজুরের স্মরণ করিয়ে দেব'খন—প্রণাম ঠাকুর মশাই!

স্বামিজী ততক্ষণ চলিতে সুরু করিয়াছেন!

ইহার কিছুকালপরে—

গ্রীষ্মের এক রৌদ্র-করোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে ঘাটে ডিঙি ভিড়াইয়া প্রতিদিনকার অভ্যাস মতো তিনু চুব্‌ড়ি বুনিতেছে, নিপুণ আঙুলে অভ্যাস মতো চুবড়ি বুনিলেও মন যেন তাহার কিসের চিন্তায় ভরপুর। সূর্য্যকিরণ তালগাছের পাশ দিয়া ডিঙির উপর ছড়াইয়া পড়িল সেই আলোয় তিনুর মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার চোখের পাতার উপরেই অস্তমান সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা আসিয়া পড়িয়াছে, তিনুর সহসা মনে হইল চোখের উপরের সেই পুঞ্জিভূত অন্ধকার যেন তরল হইয়া গিয়াছে, অবছা আলো যেন চোখের উপর দেখা যাইতেছে। জ্যোতিহীন চোখের পাতা সে একবার খুলিল আবার বন্ধ করিল। কিন্তু সেই অস্পষ্ট পাত্‌লা আলো তাহার চোখের উপর!

আশ্চর্য্য হইয়া তিনু ভাবিতে লাগিল ইহাও কি সম্ভব! চুবড়িটি পাশে সরাইয়া রাখিয়া সে আপন মনে হাসিয়া উঠিল, আপন মনে ভাবিতে লাগিল ইহাও কি সম্ভব! ভাবিল তাহার বহুদিনের কামনা আজ হয়ত স্বপ্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল—ইহা যে স্বপ্ন নহে, ইহা যে সত্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

তিনু আবার হাসিল—এবার কিন্তু তাহার চোখের কোল হইতে জল ঝরিয়া পড়িল।

ঠিক এই সময়েই পরিচিত কণ্ঠে ডাক আসিল—তিনু পার করে' দাও হে!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়!

আর কাহারও স্বর হইলে সে বিস্মিত হইত না। কিন্তু এ-কণ্ঠ স্বামিজীর, তবু সে প্রশ্ন করিল বাবাঠাকুর নাকি?

উত্তর আসিল—হাঁ ঠিকই ধরেছ তিনু, আমি একা!

তিনু ডিঙা আগাইয়া আনিয়া কহিল, উঠে আসুন।

ডিঙিতে উঠিয়াই স্বামীজী প্রশ্ন করিলেন—বউ বুঝি সহরে গেল তিনু?

তিনু নিঃসন্দেহে বলিল, আজ্ঞে না, সে বাড়ীতেই আছে কাজ কর্ম্ম নিয়ে, সহরে যাবে সেই হাটবারে। চমকিত স্বামিজী শুধু কহিলেন—হুঁ!

ডিঙা মাঝ নদীতে আসিয়া পড়িল।

কম্পিতকণ্ঠে তিনু কহিল—বাবাঠাকুর! গেলবারে আপনাকে পার করার পর থেকে আমি খালি ঠাকুরকে ডেকেচি, ঠাকুর! তুমি সবাইকে আলো দিলে আমায় কেন বঞ্চিত করলে। তাঁর চরণে বার বার দুঃখ জানিয়েচি। তা আশ্চয্যির কথা বাবাঠাকুর, আজ আমার মনে হোল আমি যেন ঝাপসা আলো দেখলাম!

স্বামিজী দৃঢ়স্বরে কহিলেন—পাগল হ'লে তিনু! তা'ও কি কখন সম্ভব!

—না বাবা ঠাকুর! নিশ্চয়ই আজ আমি আলো দেখেচি। আজ বোধ হয় রোদের ঝাঁঝ খুব বেশী!

—তা আজ কি রকম গরম পড়েছে বুঝ্‌চোনা?

—আজ্ঞে হাঁ। নদীর জল যেন ফুটন্ত গরম।

—আজকের মতো রোদ আর গরম এ বছরে হয় নি তিনু।

—তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই আলো দেখেচি, আমার চোখ আর যেন তত' অন্ধকার নয়।

—কি যে বলো বাবা, তুমি কদিন ধরে' এই কথা ভেবেচ তাই তোমার মনে হচ্চে তুমি আলো দেখতে পেয়েছ।

তিনু তথাপি দৃঢ়স্বরে জানাইল তাহার এতটুকু ভুল হয় নাই, সে ঠিকই দেখিয়াছে।

স্বামিজী তখন বলিলেন—তা হ'লে এ নেহাৎ দৈব ঘটনা তিনকড়ি! আর কাউকে বলেচ নাকি?

—আর কাউকে জানাবো কেমনে, আপনি ডাকার কিছু আগেই আমার এরকম বোধ হোল। তিনিই আপনাকে পাঠিয়েচেন!

তিনু তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল। স্বামিজী কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন—তোমার ডাক তাঁর কাছে পৌঁছেচে, তিনকড়ি। আজ রোদের তেজ খুব বেশী ছিল, তোমার চোখের ওপর সেই আলো পড়ায় চোখের শিরায় আঘাত লেগেচে। সবই তাঁর ইচ্ছা। এতকাল পরে হয়ত তুমি আমাদের মতোই দেখতে পাবে! বিধাতার বিচিত্র মহিমা!

ডিঙা ঘাটে ভিড়িল, কিন্তু স্বামিজী নামিলেন না, তিনুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—তিনু তুমি যদি কাউকে না জানাও, আমি তোমার চোখ ভালো করার চেষ্টা দেখতে পারি।

—বউকে বল্‌তে পারি ত বাবাঠাকুর?

—না বউকেও নয়। কাউকে জানান উচিৎ নয়।

—কিন্তু সে জানলে বড় খুসী হোত, আমার আবার চোখ হবে

শুন্‌লে তার বড় আহ্লাদ হ'বে, আমি তার জীবন নাকি বোঝা করে তুলেছি, এসব কথা জানলে তার মন অনেকটা হাল্কা হবে!

—না তিনু আমার কথা শোন, এখন কাউকে জানিয়ে লাভ নেই, যথাসময়ে জানিয়ো। কাল আমি আবার আস্‌বো।

স্বামিজী চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে তিনু স্বামিজীর ডাক শুনিল।

স্বামিজী কহিলেন—তিনু কল্‌কাতায় তুমি কখনও যাওনি ত,' আমার সঙ্গে কাল কল্‌কাতায় চলো, সেখানে অনেক বড় ডাক্তার আছেন তাঁদের কাছে আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

তিনু কহিল—তা হ'লে ত' বাবাঠাকুর বউকে জানানো দরকার, আমার দুচার পয়সা যা জমানো আছে তাও কাজে লাগ্‌বেখন, তা ছাড়া সব না শুনলে বউ ত' যেতে দেবেনা।

স্বামিজী ওষ্ঠ দংশন করিয়া কহিলেন—টাকার জন্যে ভেবোনা তিনু। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর বউকে বলবার যদি দরকার হয় আমিই বল্‌বো, তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। চোখটা একবার দেখি।

স্বামিজী তিনুর চোখের পাতা তুলিয়া কি দেখিতে লাগিলেন। তিনু জানাইল তাহার চোখের উপর কি নাকি ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

স্বামিজী শুধু কহিলেন—কাল কলকাতা যেতেই হ'বে,—বউকে আমি রাজী কর্‌বোই, তুমি কিছু ভেবো না তিনকড়ি!

তিনকড়ির কলিকাতা যাত্রা পরদিন স্থির হইয়া গেল।

ভোর না হইতেই স্বামিজী তিনুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত

হৈম তখন উঠানে গোময় লেপিতেছে, স্বামিজী প্রথমেই তাহাকে বলিলেন—তোমার কাছেই এলাম মা, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তা আমার ভারি ইচ্ছা এবার তিনুকে নিয়ে যাই, ভেবে দেখলাম ও বেচারারও হাওয়া বদ্‌লানো প্রয়োজন। এই হরিণডাঙ্গা আর নূরনগর এ ছাড়া আর কোথায় ও কখনো যায় নি। অন্ধ হোলেও দেশভ্রমণের প্রয়োজন ওর আছে, তাই ভাবলাম এবার তিনুও চলুক। দিন কয়েক পরেই আবার ফিরে আস্‌বে।

অসম্বৃত অঞ্চল সুবিন্যস্ত করিয়া ক্ষিপ্তের মতো হৈম কহিল, সে মিন্‌সেই বুঝি আপনার কাছে বায়না নিয়েছে, কোথায় গেলো কানা মিন্‌সে ?

স্বামিজী অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন—ছিঃ মা! স্বামীর উপর কটুকথা বল্‌তে নেই, ওকে তুমি বড় অশ্রদ্ধা করো!

ছেদ্দা, ছেদ্দাভক্তি করি কেমন করে, বছরের পর বছর ধরে খালি ওর পিণ্ডি সেদ্ধ করে চলেচি, আর কচি ছেলের মতো আগ্‌লে বেড়াচ্ছি, সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য তা টের পেলাম না, আমার বয়সী কোন্ মেয়েমানুষ এমন ধারা করে বলো ত', কোনো দিনের তরে যদি একটু যত্ন আত্তি করেছে!

ঘরের ভিতর হইতে ভয়ে ভয়ে তিনু উত্তর করিল—আমার জন্যে তুই একঘণ্টা খাটিস্ ত' ঢের, যত্ন আত্তির কথা বল্‌চিস্ তোর মুখে ত' একদিনের তরে একটা ভালো কথা শুনিনি!

হৈম চোখ বুজিয়া মুখ বিকৃত করিয়া ঘাড় বেঁকাইয়া এক অপরূপ ভঙ্গী করিয়া কহিল—শুন্‌লে ত' বাবাঠাকুর! মিন্‌সের কি আক্কেল গো, সোহাগের কথা চুলোয় যাক্ বলে কিনা যত্ন আত্তি করি না, কি

নেমখারাম এখনো চন্দর সূর্য্যি ওঠে, বলে না সেই যার জন্যে চুরি করি—, উনি রাতদিন তামাক খাবেন আর বসে বসে সাপের মন্তর আওড়াবেন, যাক্‌না বাপু কোন্ চুলোয় যাবে, আর ফিরে এসো না, যেখানে খুসী ওকে নিয়ে যাও, মিন্‌সে থেকেও ত' পেরায় কুটো ভেঙে দুটো করে—।

স্বামিজী কহিলেন—রাগ কর্‌তে নেই মা, তোমার স্বামীর চোখ নেই তাকে ওভাবে বল্লে তার মনে কষ্ট হয় না? ওর যাতে ভালো হয় তাই তোমার চেষ্টা করা উচিত—আমি ওর ভালোর দিকেই নজর রাখ্‌বো।

হৈম আবার কহিল—কি আমার সোয়ামী গো, ভাত দেবার কেউ নয় নাক কাটবার গোঁসাই। আর তাও বলি বাপু আমার সোয়ামীর ভালো মন্দয় পাঁচজনের কি? আমার ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাই নিয়ে পাঁচজনের মাথা ব্যথা কেনরে বাপু।

তিনু আর ঘরে থাকিতে পারিল না,—সরোষে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, দেখ্ বউ আমাকে যা বলিস্ বলিস্, ওঁরা হলেন ঠাকুর দেবতার সামিল। অমন করে কথা কস্‌নি বলে দিচ্ছি, জিভ্ খসে যাবে যে!

হৈম বলিল—কি আমার ঠাকুর দেবতা রে, যাওনা তোমার ঠাকুর দেবতার সঙ্গে যেখানে খুসী। কল্‌কাতায় গিয়ে থ্যাটারের গান শিখে এসো। তারপর সহসা, আরো চীৎকার করিয়া বলিল—বলি ডিঙি বাইবে কে?

হতাশ হইয়া তিনু কহিল, দেখ্‌লেন বাবাঠাকুর! আমি বলেছিলুম বউ আমায় যেতে দেবে না। তারপর হৈম'র হাত ধরিয়া মিনতির সুরে কহিল—বাবাঠাকুর কি মানুষরে বউ, তুই কিছু ভাবিস্ নি, পয়সা কড়ি

যা খরচ হবে সব উনি দেবেন, আর শশী বলেচে যে কদিন না ফিরি সেই আমার হয়ে কাজ করবে।

হৈম কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু স্বামিজীর অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উপর সহসা চোখ পড়িয়া যাইতে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

স্বামিজী শুধু কহিলেন—তা হ'লে আজ দুপুরেই আমরা যাচ্ছি।

হৈম তিনুকে ধাক্কা দিয়া ঝঙ্কারিয়া উঠিল—যাও সাজগোজ করগে, বলিয়াই পাশের ঘরে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি—

কলিকাতার এক জনবহুল পথে স্বামিজী আর তিনু পাশাপাশি চলিয়াছেন—একজনের গৈরিক আলখাল্লা ও সৌম্যমূর্ত্তি আশপাশের লোকের সম্ভ্রম সৃষ্টি করিতেছে, আর দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পল্লীযুবকের অযত্ন-বর্দ্ধিত বিশৃঙ্খল কেশরাশি হাওয়ায় উড়িতেছে, মলিন বেশভূষায় দারিদ্র্য প্রস্ফুট হইলেও সারাদেহে যেন কিসের বৈশিষ্ট্য, বহুলোকের মধ্যেও যেন এর স্বাতন্ত্র আছে।

পল্লীবাসীটি তিনকড়ি, তাহার চোখে নীলচশমা, অপূর্ব্ব কৌতূহলে তার সারা দেহমন ভরপুর।

হাঁসপাতাল হইতে তিনু আজই বাহির হইয়াছে, স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় অল্পভাষী তিনুও মুখর হইয়া উঠিয়াছে!

তিনু বলিতেছে—জানেন বাবাঠাকুর! ছেলেবেলায় এক সন্ন্যাসীর কাছে বাবা নিয়ে গিছলো, তা সে বল্‌লো, এ রোগ সারানো শিবেরও

অসাধ্য, নারাণ কবিরাজ হেসে উড়িয়ে দিয়েচে, দেখতে যে কোনোদিন পাবো তা স্বপ্নেও ভাবি নি, আপনার দয়ায় আজ তাই সম্ভব হোল।

স্বামিজী তাহার বাহু নিজের মুঠার মধ্যে ধরিলেন, হয়ত কোনো পথিকের সহিত তিনু ধাক্কা লাগাইবে ; লাইট পোষ্টে আঘাত লাগিয়া তিনু পড়িয়া যাইতেও পারে। তিনু যে আর অন্ধ নহে এ কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন।

একটি মোটরবাস ছুটিয়া চলিয়া গেলো, তিনু চশমাটি খুলিয়া অবাক হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

চোখ থাকলে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না দেখা যায়।

—আশ্চর্য্যই বটে, প্রথম দৃষ্টিতে সবই অদ্ভুত তিনু, ওই দেখ কত বড় শিবমন্দির, কত দোকান পসার দেখেচ !

তিনু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, বিস্ময়ের সীমা নাই !—কল্‌কাতার সবই তাজ্জব ! হাওয়া গাড়ীগুলো সবচেয়ে মজার, চোখ হ'বার আগে যেমনটি ভাবতুম তেমন নয় তো !

—সবই অভ্যাস হয়ে যাবে বাবা, চলো আমরা এখন আশ্রমেই ফিরি, তুমিও সেই হাসপাতালে কি খেয়েচ কখন। ক্ষিধে পেয়েচে ত' ?

—ক্ষিধে-তেষ্টা কি আর আছে, চোখ পেয়ে এখন ভাব্‌চি, কানা হয়ে আমার কেমন করে চল্‌তো।

স্বামিজী হাসিলেন মাত্র।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল।

চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, তিনু বার দুই কাপড় দিয়া চশমা মুছিয়া চোখে পরিল, তারপর অকস্মাৎ বিপন্নের মতো ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে কহিল—বাবাঠাকুর আবার বুঝি আমার চোখ গেলো !

বিস্মিত হইয়া স্বামিজী বলিলেন—সে কি তিনু! বলো কি? তাঁহারও উদ্বেগের আর সীমা নাই।

তিনু বলিল—সবই আবার আগেকার মতো অন্ধকার হয়ে গেলো! এ চোখ যে আমার না হওয়াই ছিলো ভালো!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামিজী বলিলেন—যাক্, বড়ো ভাবিয়ে তুলেছিলে তিনু, ও কিছু নয়। রাত হয়ে এলো কি না তাই অন্ধকার হয়ে গেলো, এখুনি আলো জ্বললো বলে। এটা আবার অন্ধকার পক্ষ। চাঁদ থাক্‌লে আলো হয়!—

—রাতে তাহ'লে কেউ দেখতে পায় না?

কি মধুর সরলতা!

স্বামিজী বলিলেন—দেখ্‌তে পায় বৈকি, তবে আলোর প্রয়োজন।

—অদ্ভুত! রাতে তাহ'লে সবাই কানা?

আত্মগতভাবে স্বমিজী কহিলেন—তা এক রকম কানা-ই আর কি! শুধু বিধাতার রাজ্যেই অন্ধকার নেই। সত্যের পথে সর্ব্বদাই আলো। তারপর তিনুর হাত ধরিয়া বলিলেন, চলো বাবা, তুমি যেন শিশু, নতুন করে তোমার জীবন সুরু হবে। নতুন করে তোমায় সব জানতে হবে, চিন্‌তে হবে! ভেবেছিলুম বেশ সহজ ভাবেই সব হয়ে যাবে, এখন বুঝচি কাজ কঠিন। এই গলির ভিতরেই আমার আশ্রম।

তিনু নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বামিজী আশ্চর্য্য হইয়া তিনুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এক সুন্দরী তরুণী মোটর হইতে নামিতেছে তিনু সেই দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। স্বামিজীর দিকে লক্ষ্য পড়িতেই বলিল দেখুন কেমন

সুন্দর মেয়েটী! বউকেও ঠিক এমনই দেখতে। ওই বউ কিনা কে জানে? বউ হ'লেও ওর সাথে কথা কইবার উপায় নেই।

—উনি তোমার স্ত্রী ন'ন।

—না বাবাঠাকুর বউকে অমনই দেখতে, অমনি মুখের গড়ন, অমনি পরিষ্কার,—আপনিও দেখেচেন, নয় কি? আপনি আমার দিকে ওভাবে চেয়ে আছেন কেন?

—তোমার স্ত্রীকে ওঁর মতো দেখতে নয়।

—না বাবাঠাকুর, আমি জানি বউকে অমনই দেখ্‌তে—তবে বোধ হয় আরো একটু ফাঁপালো। বউকে এখন দেখতে পেলে হোত। আমার হরিণডাঙায় ফিরে যেতে ইচ্ছে কর্‌চে। সেই ডিঙি, সেই নদী!

তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া স্বামিজী কহিলেন সবই দেখতে পাবে বাবা। আচ্ছা আজ রাতের গাড়ীতেই দেশে যাওয়া যাবে তার জন্যে কি, চলো এখন আশ্রমে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক্।

তিনু আবার স্বামিজীর সঙ্গে চলিল।

গলির ভিতর ঢুকিয়াই তাহার মনে হইল সবাই যেন তাহার দিকে কেমন করুণ ভাবে চাহিতেছে, আজ সকালেও যে তাহার দৃষ্টি শক্তি ছিল না তাহাও যেন ইহাদের অজ্ঞাত নহে। অন্যমনস্ক ভাবে চলিতে চলিতে একজনের সহিত তাহার ধাক্কা লাগিয়া গেল, লোকটি হয়ত কোনো শুভ-কার্য্যে যাইতেছিল, বিরক্ত হইয়া বলিল, কাণা নাকি! ভালো ফাঁসাদ।

তিনুর হঠাৎ বৌ-এর কথা মনে পড়িল, সে উত্তেজিত হইয়া বলিল—মুখ সাম্‌লে কথা ক'য়ো,—কেমনতর—!

স্বামিজী তাহাকে টানিয়া লইয়া এক প্রাচীন বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

ইহাই তাঁহার আশ্রম।

আশ্রমে ঢুকিয়াই এক আরসীর দিকে তিনুর চোখ পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বুঝিল ওই মূর্ত্তি তাহারই।

সেই নীল চশমা, গোলাকার রুক্ষ মুখমণ্ডল, শ্রীহীন অদ্ভুত মূর্ত্তি! সে উন্মত্তের মতো ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। স্বামিজী তাহাকে ধরিয়া কহিলেন—কি হলো তোমার তিনু। এত ভয় পেলে কিসে? সব জিনিষ এখন শান্তভাবে তোমায় গ্রহণ কর্‌তে হবে, চলো কিছু খেয়ে নিই, তারপর একটু বিশ্রাম করে একেবারে নটা চুয়াল্লিশের ট্রেন ধরা যাবে।

তিনু অর্থহীন চোখে শুধু চাহিয়া রহিল।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া স্বামিজী তিনুকে দাঁড় করাইয়া টিকিট আনিতে গেলেন। দীর্ঘদেহ অপূর্ব্ব-দর্শন তিনু নূতন জগতের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। চশমার ঘন নীল আবরণের মধ্য দিয়া যদিও সুস্পষ্ট কিছুই দেখা যাইতেছিল না তথাপি এই নূতন জগৎ তাহার মনে এক উন্মত্ত উত্তেজনা সৃষ্টি করিল। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। তাহার সুমুখ দিয়া যতগুলি স্ত্রীলোক চলিয়া গেলেন সবাইকে সে তাহার স্ত্রী বলিয়া মনে করিয়াছে। দৃষ্টি শক্তি পাইবার পর রমণীর যে রমণীয় রূপ আশ্রমে যাইবার সময়ে সে দেখিয়াছে তাহা তাহার সারা প্রাণমন ছাইয়া আছে। হৈমকে নিশ্চয়ই ওই রকম দেখিতে, এখনই না হয় একটু মোটা হয়েছে কিন্তু বিবাহের পর অবিকল অমনই ছিলো। হাসপাতালে তাহারা রঙ চিনাইয়াছিল—সেই রমণীর ঠোঁট

দুটি লাল টুকটুকে, একজোড়া ঘন-নীল নয়ন, শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণ, সে শুভ্রতায় বুঝি অন্তর গলিয়া যায়। কিন্তু গলিয়াই বা কেন যাইবে তাহা তিনু ভাবিয়া পায় না। দেখিতে পাওয়া কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। আরো নূতনতর কিছু দেখিবার জন্য সে জ্বলিতে লাগিল। তাহার দেহ মন কি যেন এক জ্বালাময় আগুনে জ্বলিতেছে, এ আগুন তাহার নিকট পরিচিত নহে।

হরিণডাঙায় ফিরিবার পথে হৈম ছাড়া আর কোনো কথা তিনুর মুখে নাই। তাহার এ ভাবান্তরে স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। এই শ্রীহীন যুবক হঠাৎ সৌন্দর্য্য দেখিয়া যে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে ইহা কম বিস্ময় নহে ফুটপাথের ওপর সেই সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া না হয় সে অভিভূত হইল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় তিনু কেন ভাবিতেছে তাহার স্ত্রী সুন্দরী! যে কালও অন্ধ ছিল, আলো ও আঁধারের পার্থক্য যাহার জানা ছিল না, সুন্দর ও কুৎসিতের তারতম্য বিচার করা যাহার অসাধ্য ছিল, তাহার মনে কেমন করিয়া ধারণা হয় তাহার স্ত্রী সুন্দরী!

স্বামিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—না হে তিনকড়ি। তোমার স্ত্রী সাধারণ গেরস্থ ঘরের মেয়েদেয় মতো, অন্য সব স্ত্রীলোকদের যেমন দেখলে তেমন কিছু আশা কোরো না। নর-নারীকে বহুরূপে, বহু ধরণে, সুন্দর ও কুৎসিত করে কেন যে বিধাতা গড়েছেন তা তিনিই জানেন। তাঁর বিধানে যারা স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্রিত হয়েচেন তাদের অনুশোচনা করা মোটেই উচিত নয়। তারা পরস্পরের দুর্ব্বলতা সহ্য করে সাংসারিক জীবনের ভার বহন করে চলবে এই তাঁর অভিলাষ।

অন্যমনস্ক তিনু কহিল—হাঁ—হাঁ। বিয়ের সময় এই সব শুনেছিলুম বটে।

স্বামিজী কহিলেন—তোমার এ-সব কথা স্মরণ আছে জেনে আনন্দ পেলাম, ঘরে ফিরে গিয়ে সস্ত্রীক তাঁকে প্রণাম জানাবে, দৃষ্টিশক্তি পেলে এ তোমার একরকম নব-জীবন! নতুন যে সব জিনিষ দেখবে তা তোমার ধারণার অতীত হলেও, সে গুলো সহ্য করতে চেষ্টা করবে, তবেই তুমি সুখী হবে।

তিনুর মন ভিজিয়া গেল। সে কহিল আমার চোখ হোল বাবা ঠাকুর। বউ আর আমায় গালাগালি দেবে না, আগের মতোই সে আমার কাছে আস্‌বে। আপনাকে বলবো কি, বহুকাল ধরে সুখ কাকে বলে তা জানিনে, এখন বোধকরি বউ আবার সুখী হবে। পূজোর সময় আমি তাকে কলকেতায় নিয়ে আস্‌বো, আর এখন যখন চোখ হোল তখন টাকা কড়িরই বা কি দরকার বলুন না। ফেরবার সময় একবার মনে হলো বউএর জন্যি কিছু নে যাই, এই ধরুন সাড়ীটা বা বেলোয়ারী চুড়ি এক কুড়ি। বেলোয়ারী চুড়ি পর্‌তে বউ বড়ো ভালোবাসে কিনা। অনেক পয়সার দরকার বলে কিনে দিতে পারিনি।

এতগুলি কথা কহিয়া সে থামিল, কে জানে হয়ত আবার স্ত্রীর ধ্যানে মগ্ন হইল।

স্বামিজীর আশ্রম হরিণডাঙা হইতে আগে পোয়াটাক যাইতে হয়। পক্ষীমাতা যেমন শাবকটিকে ডানা দিয়া আগলাইয়া রাখে স্বামিজী এতখানি পথ তিনুকে তেমনই সামলাইয়া আনিয়াছেন।

উভয়ে নীরবে পথ চলিতেছেন। তিনুর হৃদয়ের স্পন্দন ক্রমশঃ দ্রুততর হইতেছে, সে প্রথম দর্শনে হৈমের সহিত কি কথা কহিবে তাহা ভাবিয়াই আকুল।

স্ত্রীর স্বপ্নে সে বিভোর।

আর স্বামিজী ভাবিতেছেন তিনুর দৃষ্টিশক্তিলাভের প্রধান সহায়ক হইয়া তিনি কি তাহার মঙ্গল করিলেন? তিনুর কুটীরের কাছাকাছি পৌঁছিয়া তিনি কহিলেন—বাবা, এইবার আমি তোমাকে ছেড়ে যাব, তোমার ঘর কাছেই, ওই যে অল্প আলো দেখা যাচ্চে ওই তোমার বাড়ী। এই সোজা পথ চলে গিয়েছে, আমি এখন চলি, অনেকটা পথ আবার যেতে হবে, তুমি চিনে যেতে পারবে ত?

তিনু ব্যস্ত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, আপনি আসুন, আমি সব দেখতে পাচ্ছি, ঠিক চিনে যেতে পার্‌বো'খন।

জয়ের গর্ব্বে তাহার সেই শ্রীহীন মুখ উদ্ভাসিত! স্বামিজী তাহার মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় লইলেন।

দু চার পা চলিয়াই তিনুর কেমন অস্বাভাবিক বোধ হইতে লাগিল, কেমন যেন তাহার মনে হইল, এ হয়ত ভুল পথ, সে চোখ বন্ধ করিয়া অন্ধের মতো চলিতে সুরু করিল। এ পথ তাহার পরিচিতই বটে, দৃষ্টিহীনতা এক রকম মন্দ ছিল না। এই পথেই তাহার বাড়ী তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনু পদক্ষেপ গণিতে লাগিল, তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, বাড়ী আর দশ পা দূরে—সে চোখ মেলিল, কি আশ্চর্য্য! এই তাহার বাড়ী। পতনোন্মুখ এই ছোট চালা তাহার? এত রাতেও তাহার বাড়ীতে আলো? বউ বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বউকে সে এইবার দেখিবে।

তিনু জানালার পাশে গেল, সামান্য ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতরে নজর করিল, একপাশে একটি কেরোসিনের কুপী আলো অপেক্ষা অধিক ধুম উদ্গীরণ করিতেছে, আর একপাশে তখ্‌তোপোষের উপর মলিন বিছানায় দুইটি নর-নারী শুইয়া আছে।

না—ইহা কখনই তাহার বাড়ী নয়! সে ভুল দেখিয়াছে, অপর লোকের বাড়ীতে সে আসিয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। সভয়ে সে জানালার পাশ হইতে সরিয়া গেল। কিন্তু এ কাহার বাড়ী! তাহার বাড়ীর আশপাশে ত' আর কাহারও বাড়ী নাই বলিয়াই সে জানিত। সে আবার চোখ বন্ধ করিল। দুই বাহু সাম্‌নে আগাইয়া দিয়া সে চলিতে সুরু করিল। এই যে বাঁশের খুঁটি, এই সেই জিউলি গাছ,—এই যে বাগানের আগড়। চুবড়ি তৈরী করিবার জন্য এই বাঁখারি চাঁচা পড়িয়া রহিয়াছে! হাঁ—রান্নাঘরের চালে হাওয়া লাগিয়া লাউমাচার উপর হাঁড়ি দিয়া বউ যে মানুষ বানাইয়াছে তাহা নড়িতেছে,—এ তাহারই বাড়ী।

এই সময়ে ঘরের ভিতরে কে যেন কাসিয়া উঠিল। তিনু চোখ মেলিয়া চারিদিক ভালো করিয়া দেখিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের জাফ্‌রী দিয়া ঘরের ভিতরে চাহিল। দেখিল একটী মোটাসোটা স্ত্রীলোক বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার বেশবাস বিস্রস্ত, তেলের কুপীর পাশে গিয়া কি যেন শুনিবার জন্য সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল, বড় বড় দুটি চোখ, একজোড়া পুরু ঠোঁট ঈষৎ উন্মুক্ত, মিশি মাখানো কালো কালো দাঁত দেখা যাইতেছে, কলিকাতায় দেখা সেই স্ত্রীলোকটির সহিত ইহার একতিল মাত্র সাদৃশ্য নাই। তাহার মুখে চোখে এক কুৎসিৎ ভঙ্গী। তেলের কুপীর পাশ হইতে সে সরিয়া দাঁড়াইল, বিছানা হইতে উঠিয়া সেই কালো লোকটি দড়ি হইতে একটি ফতুয়া লইয়া পরিতে লাগিল, কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল কিন্তু স্ত্রীলোকটি তাহার পুরু ঠোঁটের উপর আঙ্গুল চাপা দিয়া তাহাকে বোধ হয় চুপ করিতে ইসারা করিল।

তিনু চোখ বন্ধ করিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গেল, দৃষ্টিহীনতা বিধাতার বিশেষ করুণা। অন্ধকারের আড়ালে কত কি ছিল—এক অসহ্য বেদনায় তাহার সারা দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এই তাহার ঘর তাহা সে জানে, ঘরণীকেও জানিত, কিন্তু ঘরের অধিবাসীরা তাহার কাছে আগন্তুক!

নিজের অজ্ঞাতে তিনু সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল! দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া স্ত্রীলোকটি মুখ বাড়াইয়া কহিল—কে গা? হোথায় দাঁড়িয়ে কে?

সামান্য কয়েকটি কথা—কিন্তু তাহাই তিনুর বুকে ভীষণ হইয়া বাজিল।

সে বলিল—হাঁ, আমিই গো বউ।

—ওঃ, কলকেতা থে কখন ফির্‌লে?

চশমা জোড়াটী তাড়াতাড়ি স্বামিজী-প্রদত্ত জামার পকেটে লুকাইয়া চোখ মুদিয়া তিনু বলিল—দরজা কই গো, খুঁজে পাচ্ছি না যে!

—কানা মিন্‌সের ঢঙ কতো? বলি খুব সময়ে ত' বাড়ী এলে, রাত কত হয়েচে খেয়াল আছে?

—কানা মান্‌সের আর রাত কি বউ? আমার কাছে সবটাই রাত।

দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল, পথ অনুভব করিয়া তিনু ঘরে প্রবেশ করিল, তারপর চোখ মেলিয়া সেই মানুষটিকে ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া কহিল—

একলা থাকৃতে ভয় করেনি ত' বউ?

হৈম তাড়াতাড়ি সেই পুরুষটিকে আড়াল করিয়া কহিল—ভয় কর্‌বে কি, তোমার মতন পুরুষ মানুষ বাড়ী থাক্‌লেই বুঝি ভরসা!

সেই লোকটি পায়ের আঙ্গুলে ভর দিয়া দেয়াল ধরিয়া দরজার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

হৈম আবার ইসারা করিল।

তিনু বলিতে লাগিল—আমি ভাবছিনু তুমি বুঝি একা আছ, তা মতির মা থাক্‌বে বলেছিল যে।

—সে আজ আর আস্‌তে পারে নি।

—ওঃ সে আজ আস্‌তে পারেনি বুঝি।

হৈম গলার স্বর নরম করিয়া তিনুর হাত ধরিয়া বলিল চলো বসে একটু জিরোও। খাওয়া দাওয়া হয়নি ত?

তিনুকে দরজার পাশ হইতে সরাইতে পারিলে সে বাঁচে! কিন্তু তিনু নড়িল না, হৈম তাহার নৈশ অতিথিকে আবার কটাক্ষ করিল।

সে আবার বলিল—বস্‌বে চলো না—থ্যাটারের গান শিখে এসেচো ত'?

—অনেক কিছু শিখেচি বউ, কোথায় মাছিটি পর্য্যন্ত বসে আছে বলে দিতে পারি, কার মুখে কি লেখা আছে তা-ও দেখ্‌তে শিখে এসেচি!

তিনুর হাত টানিয়া হৈম কহিল, এসো না, বাইরে যে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়্‌চে, বুঝ্‌তে পার্‌চো না!

—বৃষ্টি!—তা একটু না হয় ভিজলাম। কলকাতা বড় আজব সহর বউ, অনেক কিছুই শিখ্‌লাম, কিন্তু মানুষের গলার আওয়াজ না পেলে মানুষ চিন্‌তে ত' তারা শেখায় নি!

তাহার সারাদেহের রক্ত যেন মুখে আসিয়া জমা হইয়াছে।

হৈম রাগে জ্বলিয়া উঠিল—কহিল ওঃ, দোর বন্ধ করে দাও, রাতদুপুরে

তাড়ি খেয়ে মাত্‌লামি করার আর জায়গা পেলে না, কানা মিন্‌সের গুণ কম নয়!

হৈম আবার তাহার হাত ধরিল, তিনু তাহাকে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল—

—আমি সরে গিয়ে ওই শয়তানটার যাবার পথ করে দেব। তেমন মানুষ আমায় পাস্‌নি বউ! আমার কথার জবাব দিয়ে তবে যেতে হবে ওকে।

ঘরটিতে মুহূর্ত্তের জন্য গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল—তারপর হৈম কম্পিত কণ্ঠে কহিল—ওঃ এই জন্যে বুঝি বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে—কেন মিছে মাথা গরম কর্‌চো ঘরে কেউ নেই গো, তুমি ভুল বুঝেচ।

—সুমুন্দি আমার কথার জবাব দিক। আগে জানি ও কে তারপর তোর কথার জবাব পাবি বউ।

আগন্তুক এতক্ষণ চেষ্টা করিয়া দরজার কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, এখন তিনু ও দেয়ালের মাঝে একটু পথ করিয়া লইতে পারিলেই হয়, সহসা তিনু তাহাকে সবল বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল। সে উন্মত্তের মতো চীৎকার করিয়া উঠিল—এইবার তোকে আমি ধরেছি। আমার কথার জবাব দিয়ে তবে তুই যাবি—শয়তানীর জায়গা পাওনি! আজ তোকে খুন কর্‌বো—তিনু মাঝির রাগ জানো না, তোকে খুন করে তবে মর্‌বো!

ভয়ে হৈম অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সবলে একটি হাত মুক্ত করিয়া, দেয়াল হইতে একটি পুরাতন হাল

লইয়া তিন্নুর কপালে সজোরে মারিয়া আগন্তুক কহিল—খুন করা অতো সহজ নয় যাদু।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিন্নু—ওঃ তুমি সরকার মশাই—এই কথা বলিতে বলিতে মাটিতে পড়িয়া গেল। রক্তে চারিদিক ভাসিয়া গেল।

সরকার বোধকরি প্রাণভয়ে ছুটিয়া পালাইল।

কি যে হইয়া গেল হৈম প্রথমটা স্থির করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল তিন্নু আর বাঁচিয়া নাই, সে গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বাহিরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল।

সহসা সে কি ভাবিয়া তাড়াতাড়ি দুইচারখানি কাপড়ের এক পুঁটলী বাঁধিল, একটি বিস্কুটের টিন তাহার ভিতর সযত্নে রাখিল; তাহার চেপ্টা নাকে কুপীর ভূষা লাগিয়াছে, মাথার চুলগুলি সাপের ফণার মতো উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার সেই বীভৎস মূর্ত্তি দেখিলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে হয়!

সে একবার তিন্নুর সংজ্ঞাহীন মুখের পানে চাহিল, তারপর একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আন্না একা-ই কাঁসরডাঙায় চলিল।

মাসীর ভাসুর-পো ভোলানাথ মানুষটি মন্দ নয়। তাহাকে ক্ষেপাইতে আন্নার বড় ভালো লাগে। কোথাকার সাহেব কোম্পানীতে ভোলানাথ মোটরের কাজ শিখিতেছে, বয়স পঁচিশের নীচে হইলেও বেশ দু-পয়সা সে রোজগার করিতেছে। সামান্য কথায় আন্না তাহাকে রাগাইয়া দিয়া মজা দেখে। মানুষটি সাদাসিধা।

ভোলানাথ সবে হয়ত কারখানা হইতে ফিরিয়াছে, বেশ-বাস ধূলি-মলিন, আন্না তাহাকে বলিবে, আমার একটু এগিয়ে দেবে দাদা, পথটা বড় অন্ধকার।

ভোলানাথ বলিবে, যাঃ, এই বেশে কোথাও যায় নাকি মানুষে? দাঁড়া, জামা কাপড় ছেড়ে আসি।

আন্না হাসিয়া বলিয়া উঠিবে, বা রে, যার যা পোষাক, এতে আবার লজ্জা কোন্‌খানটায়? সেপাইরা কি তাদের পোষাক পরতে লজ্জা পায়?

উভয়ে উভয়ের দিকে কিছুকাল নীরবে চাহিয়া থাকিবে, তারপর হঠাৎ শুষ্ককণ্ঠে ভোলানাথ বলিবে, চলো তা'লে।

শালবনের পথ চলিতে কত সব আজগুবি কথা।

এমনই হইত।

চলিতে চলিতে আন্নার গতি দ্রুত হইয়া ওঠে। একাকী মাসীর বাড়ী যাইতে আন্নার আর ভয় নাই। একাকী পথ-চলায় ক্লান্তি থাকিলেও আনন্দ আছে, বিশেষ যখন বসন্তের স্পর্শে চারিদিক অকস্মাৎ মধুময় হইয়া উঠিয়াছে।

জনহীন প্রান্তর, ধূসর আকাশ—শালবনের শব্দ—মহুয়া ফুলের গন্ধ—সমস্ত মিশিয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছে। নবজীবনের সতেজ চাঞ্চল্যে আন্নার গতি মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

একা থাকার আনন্দ বহুকাল উপভোগ করা হয় নাই, নিঃসঙ্গতার আনন্দ—নির্জ্জন পথের আনন্দ—চিন্তার আনন্দ আন্নাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

সারা জগতে আন্না এখন একা—

পৃথিবী আর আন্না—আন্না আর পৃথিবী।

ওদিকে কারখানার ছুটি হইয়াছে—

ছট্টুলাল গলায় লাল রেশমের রুমাল জড়াইয়া পরমানন্দে শীষ্ দিয় সাইকেলে এই পথে চলিয়াছে। কে জানে বসন্তের ছোঁয়াচ হয়ত তাহাকেও স্পর্শ করিয়াছে। আর বসন্ত উপভোগ পথে রমণীমূর্ত্তি যে রমণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমটা এই নারী মূর্ত্তি শালবন পাহাড় ও পাখীর ডাকের-ই একটা অঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছিল। মন্দ নয়, পাহাড়—পাখীর ডাক—হাল্কা হাওয়া—হাল্কা নারী।

ছট্টুর শয়তানী চোখে উত্তেজনা ফুটিয়া উঠিল। নির্জ্জন পথে সাইকেলের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মেয়েটিকে ভালোভাবে দেখিতেই হইবে—দূর হইতে ত ভালোই মনে হইতেছে, বহুকাল ভালো মেয়ে চোখে পড়ে নাই...

ছট্টুর শীষ্ বন্ধ হইয়া গেল।

আন্নার তন্দ্রা ভাঙিয়াছে—

হঠাৎ পিছনে চাহিতেই ছট্টুর লালসাসিক্ত দৃষ্টির কুৎসিত নগ্নতা তাহার চোখে পড়িল।

কতদিন আন্না এই সব কথা ভাবিয়াছে, নিজেদের মধ্যেই এই বিপদের কথা লইয়া কতই না আলোচনা হইয়াছে, হরিমতি বলিত, ওরা যদি তোকে ধরে, কি করবি আন্না ? কালী চোখ উল্টাইয়া বলিত, কারখানার ওই সব ভূতেরা ?

আন্না বলিত, সেপাই বা মজুরদের আবার ভয় কি ভাই ? পালাবার মন থাক্‌লে খুব পালানো যায়।

হরিমতি উৎসাহিত হইয়া বলিত, ঠিক বলেছিস্ আনি, মন থাক্‌লেই হয়।

এই সব ছেলেমানুষী কথা আন্না ভুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সারা মন তখন ঐ একই চিন্তায় আচ্ছন্ন। ছট্টুর চোখের সেই তীব্র দৃষ্টি আন্নার অসহায় মনকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। আসে পাশে কোথাও জনমানবের চিহ্ন নাই।

মার মুখে এই শঙ্কার ছায়া আন্না দেখিয়াছে, সখীদের মধ্যে এই বিপদের কথা আলোচনা করিয়া কত গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় হাসিয়া বাঁচিয়াছে। আজ আর কল্পনা নয়, সত্যই সে ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্ত আসন্ন।

অপর পুরুষ চিরদিন সহাস্যে আন্নার দিকে চাহিয়াছে, সে চোখে ছিল মমতার ছায়া, তাহাতে সে কোনদিন শঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু এখন আর সে সময় নয়—সম্পূর্ণ নূতন, অপরিচিত এ দৃষ্টি। শত্রুতার কুৎসিত ইসারা এ-চোখে।

যে-বিপদের কথা বলিতে মা এতদিন লজ্জা পাইয়া আসিয়াছে সেই

বিপদ এত নিকটে, আন্না কি করিবে, কোনও উপায় নাই। ক্রমে সাইকেলের গতি মন্থর হইল, কাঁধে হাত রাখিয়া ছট্টু কহিল,

—কি সুন্দরী যাচ্ছ কোথায়? একটা কথা বলো না মাইরি, আমি ত আর বাঘ নই, চমকে উঠ্‌লে যে—'

বাঘ—সত্যই বনের বাঘ হইলে হয়ত ভালোই হইত, এখন এই নকল বাঘের হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি?

—বলি চাঁদবদনী চম্‌কে উঠ্‌লে যে!

ছট্টুর মৃদু স্পর্শ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

তীব্র অপমান-বোধ ও রাগের উন্মত্ততা আন্নাকে সাহায্য করিল। আন্না—নির্ব্বোধ আন্না—সরল আন্না সবলে ছট্টুকে ধাক্কা দিল।

বুকের উপর অতর্কিত আক্রমণে ছট্টু সবেগে খানায় পড়িল, সাইকেলটা ছিট্‌কাইয়া একপাশে পড়িয়া রহিল।

ছট্টুকে আঘাত করিবার পরই আন্না বুঝিল কাজটা ভালো হইল না। একটু হাসিয়া সামান্য কয়েকটা কথার কারসাজিতে পশুটাকে ভুলানো হয়ত সহজ হইত, বাঘকে হয়ত মাছের মত খেলানো যাইত, এমন-কি চীৎকার করিলেও চলিত, কিন্তু পশুটাকে ক্ষেপাইয়া ভীষণ ছেলেমানুষী করিয়াছে।

আন্না দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর কোনও উপায় নাই তবু শালবনের ভিতর হয়ত আশ্রয় মিলিবে। আন্না হাওয়ার মতো ছুটিল।

শালবনের গভীর জঙ্গলে লুকাইলে আর কে ধরিতে পারিবে। তবু ত মানুষের ভয়ে মরিতে হইবে না। একটু ঝোপ দেখিয়া আন্না সেই-

খানেই আশ্রয় লইল। কিন্তু আশ্রয় মিলিলে কি হইবে, কিসের যেন অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যাইতেছে, কারণ অনুসন্ধানে যাহা চোখে পড়িল তাহাতে আন্না সভয়ে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

বিশাল এক পশ্চিমা সেপাই আন্নার চোখের উপর দাঁড়াইয়া। গোঁফ ও দাড়ির জঙ্গলাবৃত প্রকাণ্ড গোলমুখ, চোখে মুখে কী নির্ম্মম রূঢ়তা। কাঠিন্যের রুক্ষ আবরণ যেন সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়রামপুরের মেলায় আন্না এই রকম যেন মুখোস দেখিয়াছিল, কে জানিত মানুষের আবার এমন মুখ হইতে পারে। বিরাট দেহে আর কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, তাহা যে শক্তির—পশুশক্তির প্রতীক, আন্না তাহা বুঝিল। আন্না কি করিবে, কোনও পথ নাই, সাম্‌নে, পিছনে চারিদিকে অন্ধকার —অন্ধকার—অন্ধকার। পুঞ্জীভূত অন্ধকার আন্নার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। আন্না কি করিবে?

সেপাইজীও হয়ত বসন্ত উপভোগে বাহির হইয়াছে, শীতের অলস অবশ দিনগুলির পর বসন্তসন্ধ্যার মধুর আমেজ তাহার অন্তরকেও স্পর্শ করিয়াছে। গভীর অরণ্যে প্যান্‌-এর মতো সেও যেন কি খুঁজিতেছে। এই শালবন যেন তাহার একার-ই সম্পত্তি। একঘেয়ে সঙ্গীতের স্বরমূর্চ্ছনায় আর কেহ মুগ্ধ না হইলেও সেপাইজীর আনন্দের সীমা নাই।

নির্ভীক দৈত্যশিশু অনন্ত নৈঃশব্দের মাঝে নিরবচ্ছিন্ন অবসর যাপন করিতেছে। কাহাকেও তাহার ভয় নাই।

পল্‌টনের সেপাই আর বনের সিংহ যে একই বস্তু তাহা ভুলিয়া আন্না নাটকীয় ভঙ্গীতে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, সেপাইজী আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—

এই কথাগুলি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় আন্না সেপাইয়ের বুকে ওপর পড়িয়া গেল।

বুকের উপর হঠাৎ তরুণীর আশ্রয়গ্রহণের কল্পনা সেপাইজী কখনও করে নাই। দারুণ বিস্ময়ে আহত হইয়া চারিদিক চাহিয়া কহিল, কি খোকী, খ্যাপা শূয়োর না ষাঁড়, কিসে তাড়া করছে—?

নিঃশ্বাস লইয়া আন্না বলিল, না না ষাঁড় নয়, কারখানার মিস্ত্রী। আমার গায়ে হাত দিয়েছে, আমায় মেরেচে, বাঁচাও সেপাইজী আমাকে বাঁচাও।

দৈবপ্রেরিত এই অতিকায় মানুষটির সাহায্যে আন্না কাঁদিয়া ফেলিল।

—হুঁ, কলের মিস্ত্রী আছে তা পালালে কি হবে, তাকে ধরতে হবে ত!

মাধু সিং অর্থাৎ সেপাইজী এইসব কলকারখানার মিস্ত্রী মজুরদের ঘৃণা করিত, কারণ সেপাইদের তারা বড় একটা গ্রাহ্যই করে না। আর এই নারী, তন্বী তরুণী নারী সাহায্য ভিক্ষা করিতেছে, এই চিন্তায় মাধু সিংএর তনুমন পুলকে শিহরিয়া উঠিল।

কৈশোরে ছোট সাহেবের মেয়ে এলিসকে একবার কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, তাহার পর এ-আনন্দ, এ-রোমাঞ্চ আর সে অনুভব করে নাই।

তখন তাহার বয়স বড় জোর সতেরো কি আঠারো হইবে, আজো সে কথা সঠিক মনে আছে। মেমসাহেব ত আনন্দে মাধু'র গলা জড়াইয়া চুম্বন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। ছোট সাহেব স্বয়ং সেদিন মাধুর পিঠ চাপড়াইয়া ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। রাজগড়ে সে কি দিনই না গিয়াছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল রাজগড়ের স্মৃতি আজো মাধু সিং-এর মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তারপর মেমসাহেব—

'সেপাইজী চলো আমরা পালাই, ওই তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে যেন—' শঙ্কিত আন্না মাধু-র চিন্তাস্রোতে বাধা দিল।

—না খোকী নাঃ—ডর্ নেই কিছু।

মাধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর সারা বনটিতে প্রতিধ্বনিত হইল, নীচু গলায় কথা বলার অভ্যাস ইহাদের নাই।

আন্নাকে ঝোপের পাশে সরাইয়া মাধু ছট্টুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ছট্টু তাহাদের দেখিয়াছে, কিন্তু ছট্টু কাছে আসিবার আগেই মাধু কৌশলে তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। তারপর—তারপর আন্না আর দেখিতে পারে নাই। আন্না যখন চোখ খুলিল তখন ছট্টু অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে।

অবলীলাক্রমে আমরা সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণী যে আনন্দে মারিয়া থাকি—মাধু সিং সেই ভাবেই ছট্টুকে আহত করিল। আন্নার আতঙ্কমিশ্রিত চীৎকারে তাহার চমকভাঙিল।

মাধু সিং সদম্ভে কহিল, আর ডর নেই, আর তোমায় তাড়া করবে না খোকী।

যে-পশুশক্তি মাধুর কাছে সরল, ও সহজ আন্নার চোখে তাহা পশুত্ব ছাড়া আর কিছুই মনে হইল না। এখন আন্না বুঝিল এ সেই সেপাই, যাদের সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই সতর্কতার আর সীমা নাই। সেই সেপাই আর আন্না এখন নির্জ্জন পথে, একা আন্নার ভয় করিতেছে বটে, তবে মিস্ত্রী কাঁধে হাত দিবার পর যে ভয় মনে ছিল সে ভয় আর নাই। সেপাইজী আর যাহাই হউক, কিছু মহত্ত্ব তাহার আছে তবুও সাবধানে চলিতে হইবে, বাঘ—বাঘই, যতই না সে গেরুয়ায় গা ঢাকুক।

আন্না তখন মরজগতে ফিরিতেছে।

—তোমায় কি বলব সেপাইজি, কি বিপদ থেকেই না আমায় বাঁচালে!—সঙ্কোচের গণ্ডী কাটাইয়া আন্না এতগুলি কথা বলিয়া ফেলিল।

সেপাইজী কি ভাবিল কে জানে, সহসা আন্নাকে বলিল, তোমার বাড়ী কোথায়, চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।

আন্না তখনও বুঝিতে পারিতেছে না, ভাবিল, মন্দ নয় বাঘের নিঃশ্বাস পিছনে শোনার চেয়ে বাঘ সঙ্গে থাকাই ভালো।

মাধুর কৈশোর ও যৌবনের মধুময় দিনগুলি কাটিয়াছে সাহেব বাড়ীর কাজে। শিয়ালকোটে—রাজবাড়িতে—দেরাদূনের হোটেলে কতদিন সে কাটাইয়া দিয়াছে। কালা আদমি বলিয়া, মিসিবাবারা ত তাহাকে মানুষ বলিয়া গণ্যই করিত না, কতদিন অর্দ্ধনগ্ন বা নগ্ন অবস্থায় তাহার সামনে পড়িয়াছে কিন্তু তাহারা এমন ভাব দেখাইয়াছে যে দোষ যেন সব কালা আদমির-ই। তারপর দেরাদূনের কাজ ছাড়িয়াই সে লছমনীয়াকে বিবাহ করিল।

বনের পথে মাধু সিং ও আন্না—

সুন্দরী আন্না—তরুণী আন্না—মাধুর সহচরী। মাধু মাঝে মাঝে আন্নার সুশ্রী মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া দেখিতেছে আবার সে সংযত হইয়া উঠিতেছে। এ মুখ তাহার বহু পরিচিত—লছমনীয়ার ছিল এই মুখ, এলিস মেমসাহেবেরও যেন এই মুখ, যাক সে কথা—

লছমনীয়াকে লইয়া দিনগুলি মন্দ কাটে নাই। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ, তাইতো মাধুর ঘরে আগুন লাগিল। ডাকাতে মাধুর যথাসর্ব্বস্ব, অর্থাৎ টাকা, লছমনীয়া ও এক বছরের মেয়ে দুলালীকে লইয়া গেল। কত দেশ খুঁজিয়াও তাহাদের আর সন্ধান হইল না। এর কিছুদিন পর-ই নারীহরণের সেই মামলাটায় তাহার সাত বছর জেল হইয়া গেল। জেল হইতে ফিরিয়াই ত সর্দ্দারজীর সঙ্গে আলাপ। তারপর এই পল্টনে দিন কাটিতেছে।

নারীহরণের আসামী আজ সুন্দরী তরুণীর সহচর, মাধু-র হাসি পাইতেছে। মুহূর্ত্তের মোহে তার সেই অতীত কৈশোর ফিরিয়া আসিয়াছে, যে-কৈশোরে সে এলিসকে উদ্ধার করিয়াছিল। জয়গৌরবে তাহার বিশাল বক্ষ স্পন্দিত হইল। হাতের মুঠির মধ্যে এই মেয়ে, মাধু মনে করিলে কিনা করিতে পারে, কিন্তু নাঃ—। কুমারীর রূপ—সুন্দরীর রূপ সে আর একবার দেখিয়া লইল।

আন্না অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। তাহার সখীদল—বাবা আর মা—কাকারা আর মামারা—মাসী আর খুড়ী ইত্যাদি কত শত অবান্তর কথাই না সে বলিতেছে। আন্না মোটেই বোঝে নাই এই সব কথা সেপাই-এর কানে কেমন লাগে। দুর্গম পথে সঙ্গীর আবির্ভাবে তার দেহমন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যৌবনোদ্‌গমের পর কয়জন নারীই বা মাধুর সঙ্গে এই ভাবে কথা কহিয়াছে, বুভুক্ষ প্রাণের ক্ষুধা অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

আন্নার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়াছে, শঙ্কার অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে, সহসা আন্না কহিল, সেপাইজি, দেশ কোথায় তোমার? এদেশে এসেচ কেন?

এ প্রশ্ন গৃহহীন মাধুর মনে আঘাত করিয়া বাজিল। ভারী গলায় সে উত্তর করিল, জলন্ধরের নাম শুনেচ, ওইখানে আমার বাড়ী, চাকরি করতে করতে তোমার দেশে এসে পড়েচি।

মাধুর স্নায়ু-শিরায় ধর্ম্মের ছোঁয়াচ—পুণ্যের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। মাধু তাহার সর্দ্দারকে বলিবে, কেমন করিয়া সে এই অসহায় তরুণীকে দুর্ব্বৃত্তের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে।

আন্নার গতি শঙ্কাহীন, বলাকার মতো তার লঘু গতি। কুয়াসা কাটিয়া গিয়া আসিয়াছে সুতীব্র উন্মুক্তি।

আর মাধুর একি পরিবর্ত্তন! হাতের মুঠির ভিতর হইতে সে শীকার ছাড়িয়া দিতেছে, মাধুর সেই নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা মুছিয়া গিয়াছে, নারীদেহের স্পর্শে সে উচ্ছৃঙ্খলতা ভুলিল।

আন্না বলিল, সেপাইজী এই আমার মাসীর বাড়ী এসে পড়েচি, তুমিও এসোনা সাহেব, মাসিকে দেখে যাবে।

মাধু সিং ভাঙা গলায় বিনীতভাবে কহিল, না খুকী—না, আজ আর নয়।

আন্না বুঝিল কি বুঝিল না, বিদায় লইয়া মুক্ত পাখীর মতো চলিয়া গেল।

মাধু সেই বন-হরিণীর গতিপথে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। নির্ব্বাক—নিস্পন্দ মাধু নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এক সুতীব্র অনুভূতি তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে।

মাধু সিং ছাউনীতে ফিরিতেছে—

মিস্ত্রিটাকে অমন করিয়া মারা হয় ত ভালো হয় নাই, কোন মানুষকেই মারিবার তার অধিকার নাই।

সর্দ্দারজী এই সব কথা শুনিয়া ভারী আনন্দ পাইবে, উচ্ছৃঙ্খল কদাচারের হাত হইতে সে নারীকে বাঁচাইয়াছে, নারীর সম্মান বাঁচাইয়াছে।

নিজের মহত্ত্বের নেশায় মাধু অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মাধু কি পাগল হইয়া গেল? আনন্দে তার দেহমন রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে!

দুইচারিটি বনফুল কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া মাধু তাহার উদ্ধত পাগ্‌ড়ির মাথায় গুঁজিয়াছে। লাঠিটি কাঁধে তুলিয়াছে। আজ সে সত্যই খুসী। আনন্দে সারা দেহ তার আর্ত্তনাদ করিতেছে।

উন্মত্ত সুখের উত্তেজনায় মাধু গান ধরিয়াছে, পাহাড়ি সুরের গান, 'মুঝে মিলা দে মুঝকো নন্দলালা।' মাধু এখন কি না করিতে পারে।

এদিকে দক্ষিণা হাওয়ার স্পর্শে ছট্টুর চৈতন্য ফিরিয়াছে, মাধুর অত্যাচারের প্রতিশোধ সে লইবেই। মাধুর গলার আওয়াজে সে প্রস্তুত হইতে লাগিল। ফুলভারাবনত দুইটি পাহাড়ি লতানো গাছের অন্তরালে নিজেকে লুকাইয়া ট্যাঁক হইতে সে কি যেন বাহির করিল। সে তো আর জানে না মাধু তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিতেছে। দুটি তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিশোধের আগুন জ্বালাইয়া ছট্টু সেপাই-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মাধু সিং—আনন্দমুখর মাধু সিং আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সকল আনন্দ, সকল উত্তেজনার অবসান করিয়া দিল ছট্টু।

অস্ফুট আর্ত্তনাদে মাধুর বিশাল দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

জয় পরাজয়

সুনীল সমুদ্রের মধ্যে একদা ভেনাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই কাহিনীর নায়িকার অভ্যুদয়ের মধ্যেও কতকটা সেই অলিম্পিয় প্রেরণা বর্ত্তমান। কোনোকালে যে ভেনাস বা উর্ব্বশীর মতো বনলতা মুকুলিকা বালিকা বয়সী ছিলেন তাহা নয়, হয়ত সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে, তবে ফৈজাবাদে তাঁহার আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই রহস্যাচ্ছন্ন। সহসা একদিন শহরে বনলতা সম্পর্কে জল্পনার আর অন্ত রহিল না, সে সব কথার সূত্র এতদিন পরে স্মরণ করা শক্ত তবে বনলতার সাড়ী, বনলতার বাড়ী, বনলতার গাড়ী এই তিনটি বিশেষ জিনিষ সকলের কাছে অতি পরিচিত হইয়া উঠিল, অথচ কেহই জানিত না কি তাহার পরিচয়। তখনকার কালে শহরে সেই একমাত্র চাঞ্চল্য। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী কারণে অকারণে বনলতার প্রশংসা করাই যেন তাহাদের পেশা হইয়া দাঁড়াইল, চল্লিশের উর্দ্ধ হইতে পঞ্চাশের প্রান্তে যাঁহারা পৌছিয়াছেন তাঁহারা এ প্রসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

বনলতার দর্শনই অনেকের কাছে যথেষ্ট ছিল, সন্ধ্যার পর বনলতার এস্প্লানেড্ রোডের বাড়ির আশে পাশে ভীড় বাড়িতে লাগিল, বনলতা ভালো গান গায়। বনলতা নাকি ডাক্তারি করিবার উদ্দেশ্যেই এখানে আসিয়াছিল কিন্তু প্রাক্টিস্ করিবার পূর্ব্বেই ডাঃ বি, কে সেন তাঁহার

পাণিগ্রহণ করিলেন। ডাক্তার সেনের এই সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ায় অনেকে তাঁহাকে সৎ-পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু মৃদু হাসিয়া ডাক্তার সাহেব তাঁহার অবিচল সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এক শুভলগ্নে বনলতার উপাধি সেনে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আজ মনে হয় এই রমণীর জীবন-রহস্য হয়ত একমাত্র ডাক্তারবাবু-ই জানিতেন।

এ বিবাহ কিন্তু, সুখের হইল না। ফৈজাবাদে তখনকার দিনে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হইলেও নিজের প্লুরেসি ডাঃ সেন নিরাময় করিতে পারিলেন না, ফলে একবছরের মধ্যেই বনলতাকে বৈধব্য বরণ করিতে হইল।

ফৈজাবাদে বনলতার আর দিন কাটে না—

এখানকার সমাজে প্রতিষ্ঠা তাহার কোনদিনই ছিল না, ডাঃ সেনের মৃত্যুর পর বনলতার জীবন-যাত্রার মসৃণ পথে বাধা পড়িল। অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের মধ্যে বনলতার নিশ্বাস ফেলিতেও যেন কষ্ট হইতে লাগিল, ফলে একদিন ফৈজাবাদের বাঙালী সমাজ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করিল যে ডাঃ সেনের দাওয়াইখানা বন্ধ করিয়া বনলতা নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছেন।

ইহার পর যবনিকা উঠিল কলিকাতার কাছাকাছি এক গ্রামে—গ্রামখানি ছোট হইলেও রেল কোম্পানীর দৌলতে প্রতিপত্তি তাহার কম নয়, কলের জল হইতে সুরু করিয়া বিজলী আলো পর্য্যন্ত যাবতীয় নাগরিক সুবিধাই বর্ত্তমান। রেলের সাহেব ও বাবুদের কৃপায় গ্রামটি প্রায় শহর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাগান বাড়ীগুলিতে ছুটির দিনে মজলিস জমিয়া ওঠে। হরিহর হালদারের অবস্থাটা কিছু ভালো, লোকে তাই তাঁহাকে রাজাবাবু নাম দিয়াছে, আর অবসর লইয়া রায় বাহাদুর

দীননাথ মজুমদারও এইখানেই অবস্থান করিতেছেন। বনলতা এইখানে আসিয়াই উঠিল। আর কোনও সহায় না থাকিলেও তাহার একমাত্র সহায় ছিল অর্থ সম্পদ—বনলতা অনাথ আশ্রমের পাশের জমিতেই নীড় বাঁধিল। নীড় বলিলাম বটে, আসলে কিন্তু তাহা প্রাসাদ—প্রশস্ত বাগানের কল্যাণে বনলতার বাড়ির শোভা বাড়িয়া গেল।

ফৈজাবাদে বনলতার বহু পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল, এখানে তাহার অর্থসম্পদ ভিন্ন তার কিছুই আলোচনা করিবার রহিল না। কিন্তু এই আত্মীয় বন্ধুহীনা রমণীর অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে সত্য মিথ্যা জড়াইয়া নানা কথা ও উপকথার সৃষ্টি করিতে লাগিল। কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য অল্পই—সুতরাং কল্পনাই ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইল। লোকে জানিল বনলতার টাকা আছে, টাকার পরিমাণ লইয়া সঠিক অনুমান কেহই করিতে পারিল না বটে তবু সে বিষয়ে গবেষণা চলিতে লাগিল। টাকায় অনেক কিছু কেনা যায়—টাকায় বনলতা বাড়ী কিনিয়াছে যাহা এতদিন বনলতার স্বপ্নে ছিল আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইল, বাগান, বাড়ী, পুকুর। আধুনিকতম মোটরগাড়ী, দাসদাসী—কিছুরই অভাব রহিল না, টাকায় বনলতার সবই মিলিল, কিন্তু একটি জিনিষ ক্রমশঃই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল, প্রতিবেশীর সখ্যতা ও সহযোগিতা কিছুতেই বনলতার মিলিল না।

বনলতা চৌধুরীদের বাড়ী নীলামে কিনিয়াছিল, চৌধুরীরা এ অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দা, গ্রামের লোকেরা তাহাদের ভালোবাসিত, চৌধুরীদের এই দুর্দ্দিনে তাহারা কতকটা আঘাত পাইয়াছিল, সুতরাং বনলতার ওপর আক্রোশ হওয়া স্বাভাবিক। তাহা ছাড়া বোধকরি

জীবনের ইতিহাস সম্বন্ধে সন্দেহ থাকায় এই অসহযোগিতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল।

দীর্ঘ ছমাস চেষ্টার পরও বনলতার সহিত কাহারও পরিচয় হইল না, দু এক জায়গায় সে স্বয়ং গিয়াছে কিন্তু এমন অদ্ভুত অস্বাচ্ছন্দ্য সেখানে লক্ষ্য করিয়াছে যে তাড়াতাড়ি পালাইয়া আসিয়াছে। বনলতা ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না, সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে কিন্তু সহযোগী-তার প্রসন্ন হস্ত প্রসারিত হওয়া কঠিন। গ্রামে মেয়েদের স্কুলে বনলতা মোটা টাকা সাহায্য করিয়াছে, অনাথ আশ্রমের গৃহ নির্ম্মাণ ভাণ্ডারেও অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, একটা পাকা রাস্তা বনলতার খরচে তৈরী হইয়াছে, তবুও দেশের লোকের সহানুভূতি তাহার কাছে তেমনই দুর্ল্ভ হইয়া রহিল।

সুতরাং নিরালায় নিঃসঙ্গ জীবনযাপন ছাড়া বনলতা আর কি করিতে পারে, দক্ষিণের প্রশস্ত বারান্দায় বনলতা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু এই কি অবসর! ফৈজাবাদের আনন্দোজ্জ্বল জীবন ত্যাগ করিয়া এই পল্লীপ্রান্তে নীরবে দিনাতিপাত করিতেই কি বনলতা এখানে আসিয়াছিল! এখনও দীর্ঘ পথ—কঙ্কর কঠিন বন্ধুর পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এত ঐশ্বর্য্য, বিলাস, যদি ভোগেই না লাগিল তবে কি তার সার্থকতা! ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রপুরীর মধ্যে না থাকিয়া বনলতা যদি অরণ্যে বাস করিত তাহাতে কি আসিয়া যাইত।

অবশেষে একদিন নিঃসঙ্গতার ক্লান্তিতে বনলতা স্থির করিল মান সম্ভ্রম ভাসিয়া যাক আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। এ অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে রায় বাহাদুর গিন্নী মণিকুন্তলা তবু বনলতার প্রতি একদিন সামান্য সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইয়াছিলেন—সেই

সমবেদনার যোগসূত্র ধরিয়া বনলতা মণিকুন্তলার সহিত দেখা করিতে গেল। কোথায় তাহার ত্রুটি, কি তাহার অপরাধ বনলতা আজ তাহা জানিয়া লইবে।

মণিকুন্তলা বাগানে দাঁড়াইয়াছিলেন, পাশে তাঁর মেয়ে মাধবী, মেয়েটি সুশ্রী ও আধুনিক। বনলতার মনে হইল এমন মেয়ে সে যেন কখনও দেখে নাই। মেয়েদের হাসিও যেন আজ দেখিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বনলতার আগমনে কিন্তু সে হাসি থামিল, মাধবী বন-লতাকে দেখিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বনলতা মণিকুন্তলাকে প্রণাম করিয়া কহিল—এ সময় এলুম বলে মাফ্ করবেন, কিন্তু আপনার কাছে আমার বড় দরকার, এদেশে একমাত্র আপনার কাছেই আমি দুকথা জান্‌তে পারি।

মণিকুন্তলার বয়স হইয়াছে, অনেক কিছুই তিনি দেখিয়াছেন এবং জানেন, গলার স্বর যথাসম্ভব মিহি করিয়া কহিলেন—

—সেকি কথা বোন্, নিশ্চয়ই আসবে, চলো ঐ বেঞ্চিটায় বসা যাক্। ওখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে।

প্রকাণ্ড অশোকগাছের তলায় লোহার বেঞ্চ পাতা ছিল, সেখানে বসিয়া বনলতাই প্রথমে কহিল—

—দিদি, আমার কি অপরাধ ?

বিস্ময়বিমূঢ়া মণিকুন্তলা বলিলেন—অপরাধ ? তোমার আবার কি অপরাধ ?

—কিছু ত্রুটি আমার নিশ্চয়ই আছে, নইলে আপনি বা এখানকার সকলেই আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন কেন ?

এ সংবাদে মণিকুন্তলা যেন যথেষ্টই ব্যথিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু বনলতা, আমি ত' ভাই এ ব্যাপারের কিছুই জানি না, আমি ত' তোমার নামে কিছু বলিনি।

স্পষ্টই বনলতা বলিয়া ফেলিল—আপনি জানেন আমি কি বলতে চাই, আপনি নিশ্চয়ই জানেন কেন সবাই আমার ওপর বিরূপ, অন্ততঃ আপনার মেয়ে তার বিতৃষ্ণা গোপন করেনি।

মণিকুন্তলা ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন মাত্র, এ কথার আর জবাব দিলেন না।

উত্তেজিতা বনলতা বলিতে লাগিল, আজ ছমাস আমি এদেশে এসেছি, কিন্তু এখানকার কেউ আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলেন নি। আমি শক্ত মেয়ে দিদি, নইলে মান খুইয়ে আপনার কাছে আস্‌তে পার্‌তাম না, কিন্তু আমি আর পারি না, একা একা এতবড় বাড়ীতে দিন আমার আর কাটে না। আমি চাই আপনাদের সঙ্গে মিশ্‌তে, আর পাঁচজনের মতো হয়ে থাক্‌তে, কিন্তু আপনারাই আমাকে সমাজচ্যুত করেছেন—আমার দাবী সামান্যই!

প্রস্ফুটিত জিনিয়ার দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি মণিকুন্তলা তবুও নীরব।

বনলতা বলিতে লাগিল—দেখুন লোকে জানে আমার টাকা আছে, আমার ঐশ্বর্য্য অনেকের কাছে সন্দেহের কারণ তাও আমি জানি, কিন্তু আমার স্বামীর নামে ফৈজাবাদের পথের লোকও আপনাকে আপনার করে নেবে। আমার এ অর্থ পাপার্জ্জিত নয়, আমি মানুষ, আমারও অনুভূতি আছে, এই গ্রামেই—

বনলতা একটু থামিয়া বলিয়া ফেলিল—এই গ্রামেই আমি মানুষ হয়েছি দিদি, এই আমার জন্মভূমি।

এতক্ষণে মণিকুন্তলা সামান্য হাসিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন—

—তাই নাকি ? তাতো জানিনে, কি আশ্চর্য্য ! এখানে কোথায় তোমাদের বাড়ী ছিল ?

বনলতা বাধা দিয়া কহিল—সে কথা থাক্ আজ দিদি, এই জন্যেই বড় আশা করে আমি এত দেশ থাক্‌তে এই গাঁয়ে বাসা বেঁধেছি। এই আমার স্বপ্ন ছিল, অনেক দিনের আশা ! আজ এই চল্লিশ বছর পরে এ দেশে কি আমি একঘরে হয়ে থাক্‌তে এসেছি !

মণিকুন্তলা অনেকক্ষণ নীরবে একটি ক্রোটোণ গাছের পাতা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন—অবশেষে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিলেন—কথাটা কি জানো বনলতা, এটা হোল আমাদের বাংলা দেশ, তায় আবার পাড়াগাঁ, এখানকার সবাই গোঁড়া প্রকৃতির, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার জ্ঞান, তোমার অভিজ্ঞতার কাছেই আমরা ছোট হয়ে আছি, তারপর তোমার পয়সা আছে, তুমি হয়ত বল্‌বে গেঁয়ো মন, তা বল্‌তে পারো, তবে কি জানো এখানে আচার বিচার বড় বেশী, সমাজ জায়গা কিনা, তা অবশ্য, তোমার জন্যে আমি একটা ভালো জায়গা দেখে দিতে পারি, সেখানে তুমি শান্তি—'

—তার মানে এ দেশ থেকে বিদায় হবো ? কিন্তু তার আগে আমি জান্‌তে চাই এ গাঁয়ের আমি কি করেছি, কোথায় আমার ত্রুটি।

—কিছু নয়—কিছু নয়। দোষ তোমার কিছুই নয়। তুমি শুধু অচেনা বিদেশিনী-এ ছাড়া তোমার আর কি দোষ আছে ! এখানকার লোক শুধু তোমার খবর জেনেই ঠাণ্ডা হবে না, তারা চাইবে তোমার

বাপ, ঠাকুর্দ্দা, চোদ্দ পুরুষের ইতিহাস, হয়ত তুমি বল্‌বে কি অসভ্য। কিন্তু এই এখানকার রীতি, এমনই হয়। এটা অন্যায় বটে, তবু এর পরিবর্ত্তন নেই। আমাদের এ গাঁয়ে আলাপ পরিচয় হতে সময় লাগে, এখন দুচার বছর তোমায় হয়ত অপেক্ষা কর্‌তে হবে।

বনলতা বলিল—সারা জীবনটাই অপেক্ষা কর্‌তে হবে হয়ত?

মণিকুন্তলা ঘাড় নেড়ে বল্লেন—তাও যে হয় না তা নয়, তোমার ভবিষ্যতে কি আছে আমি বল্‌তে পারি না, আশাও আমার বেশী নেই। তবে একটা কাজ কর্‌তে পারো, নিজের হাতে বাজার হাট করো, চাষা-ভূষোদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক্, তাদের কাছ থেকে সম্মান পেলে তখন গাঁয়ের লোকও সম্মান কর্‌বে। তারপর মনে কর পূজো পার্ব্বন—তা সে সব কি আর তোমরা মানো!

—পূজো পার্ব্বন মানিনা মানে? আমরা হিন্দু, আর সবাই যেমন ঠাকুর দেবতা মানে, আমরা কি তাদের ছাড়া দিদি! যুগই পরিবর্ত্তন হয়েছে, মনের পরিবর্ত্তন হয়নি আজো।

মণিকুন্তলা বল্লেন—পূজো মানে, দুর্গাপূজো, কালিপূজো, রথ, দোল, চড়ক। আমাদের হিন্দুর যা বড়ো বড়ো পূজো, এই ত হালদারদের বাড়ী আজ ক'বছর দুর্গাপূজো হচ্ছে।

সহসা কি যে হইল কে জানে, বনলতা কহিল—

হালদার বাড়ী মানে জমিদার বাড়ী ত? সাম্‌নেই ত' পূজো আসছে, আমিও এবার দুর্গাপূজো কর্‌বো।

মণিকুন্তলা বনলতার স্পর্দ্ধা দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেও কহিলেন—বেশ ত' সে যদি পারো তা ভালোই, আমাদের দ্বারা যতটুকু সাহায্য সম্ভব আমরা কর্‌বোই।

বনলতা উঠিয়া দাঁড়াইল—বলিল—মনের দুঃখে অনেক কথাই বল্লাম দিদি, অপরাধ নেবেন না—

মণিকুন্তলা গম্ভীরভাবে হাসিলেন মাত্র।

বনলতার বাড়ীতে পূজোর আয়োজন চলিতেছে—দেবীপক্ষ পড়িয়া গিয়াছে সুতরাং আর বেশী দেরীও নাই। একদিন সকালে সরকার মশাই বনলতাকে বলিলেন—মা, হালদার বাড়ীর মেজ কর্ত্তা আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।

বনলতা বিস্মিত হইয়া কহিল—কারণটা কি সরকার মশাই, আপনার কিছু অনুমান হয়?

সরকার মশাই প্রবীণ লোক, কহিলেন—কারণ ত' অনেক কিছুই মনে হয় মা, তবে বোধ হয় পূজো সম্পর্কেই কিছু বল্‌তে এসেছেন বলে মনে হোল। আমি বল্লাম, মা ঠাক্‌রুন ত' আপনার সামনে আস্‌বেন না, তাতে খুব চটে উঠে বল্লেন, তুমি তোমার মা ঠাকরুণকে একবার আমার নামটা জানিও, আমার নাম হরিহর, বুঝলে?

বনলতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে কহিল, আচ্ছা সরকার মশাই, আমি পরদার পাশে দাঁড়িয়ে ওঁদের যা বল্‌বার আছে শুন্‌বো। বেরোতে আমার আপত্তি ছিল না, তবে এটা নাকি সমাজ জায়গা।

তৎক্ষণাৎ সব বন্দোবস্ত হইয়া গেল—বনলতা পর্দ্দার পাশে আসিয়া কহিল—সরকার মশাই, আপনি ওঁকে বস্‌তে বলুন—

—না—না থাক, আমি বস্‌বার জন্যে আসিনি। আমার আরো

পাঁচটা কাজ আছে, আমি এলুম, তোমার কাছে, শুন্‌লুম তুমি নাকি এবার দুর্গাপূজো কর্‌বে ঠিক করেছো ?

পর্দ্দার আড়াল থেকে বনলতা কহিল—সরকার মশাই ওঁকে বলুন যে উনি ঠিকই শুনেছেন !

—দুগ্‌গা পূজোটুজো চল্‌বে না বাপু ! সেই যে বলেনা হয় না ষষ্ঠীপূজো, রাতারাতি দশভূজো !

বনলতা বিস্মিত হইয়া কহিল—তার মানে, আমার পূজো করার অধিকারও কি আপনাদের হাতে নাকি ?

—অধিকার টধিকার জানি না, এ অঞ্চলে হালদারদের একখানা পূজো ক'বছর ধরে হয়ে আস্‌ছে। আজ তুমি কোথাকার কে, যার বাপ মার নাম কেউ জানে না হঠাৎ এসে যে দুগ্‌গা পূজো করে আমাদের উপর টেক্কা দেবে তা হবে না।

—আপনি কি ভেবেছেন, আমি বৃথাই পয়সা খরচ কর্‌চি। আর দেখুন আমার বাপ মার নাম আমার কাছেই স্মরণীয়, আপনাদের কাছে আমি ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে আসিনি, আমার বাপ মার নাম আপনারা না জান্‌লেও পূজো তাতে আট্‌কাবে না।

স্তম্ভিত হরিহর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন —বেশ, কিন্তু পরে এর জন্যে অনুতাপ কোরো না।

হরিহর সরোষে চলিয়া গেলেন।

বনলতা নিস্পন্দের মতো দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সরকার মশাইকে দেখিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল,—আচ্ছা সরকার মশাই, আপনি ত' শুনেছি লটারীর টিকিট কেনেন ?

বিস্মিত সরকার বলিল—তা কিনি বটে—কিন্তু !

—লটারী মানে জুয়ো ত’? কম পয়সার জুয়াখেলা।

জুয়া যদি খেলেন বেশী টাকার বাজী ধর্‌বেন—জিত্‌লেন ত’ ব্যস্‌। আর হারলেই ডুবলেন—।

এ অমূল্য তথ্য সরকার মশায়ের অজ্ঞাত ছিলনা, কিন্তু এই আকস্মিক উপদেশের কারণ বোঝা গেল না, সরকার মশাই কহিলেন—আচ্ছা মা, তাই কর্‌বো।

ষষ্ঠী, সপ্তমী, কাটিয়া গেল। সারা গাঁয়ের লোককে বনলতা বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, কিন্তু এই দুইদিনে কেহ আসে নাই। আজ মহাষ্টমী, হতাশ বনলতা তবু আয়োজন কিছুই কমায় নাই। কিন্তু মহাষ্টমীও কাটিতে চলিল, আজ কেহও বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতেও আসিল না। সারা গ্রামে সকলেই জানিত যে মহাষ্টমীর দিন কলিকাতার শ্রীনাথ অপেরা পার্টির ‘স্থভদ্রা হরণ’ গীতাভিনয় হইবে। কিন্তু দুপুরে লোক হয় নাই বলিয়া যাত্রা বসে নাই। অবশেষে সন্ধ্যায় বসিবে ঠিক করিয়া অধিকারী সদলবলে দিবানিদ্রা সারিতেছেন।

বনলতা দক্ষিণের বারান্দায় ম্লান মুখে বসিয়া আছে। আকাশে মেঘের লেশ নাই, শরৎকালের মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া বনলতা নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। বাল্যজীবন, যৌবনের আনন্দোচ্ছল দিনের মাদকতা, তারপর ফৈজাবাদ,—

কিন্তু একি—হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা—দুর্গাপূজা, অজস্র অর্থব্যয়ে বনলতা আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু এ গ্রামের লোক পূজা দেখিতেও আসে নাই। বনলতা বেশী টাকার বাজী ধরিয়াছিল কিন্তু সে

জিতিতে পারে নাই—ভীষণ পরাজয় ঘটিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর সীমারেখা এইখানেই শেষ হয় নাই—পৃথিবীর পরিধি হয় ত আরো বৃহত্তর—সহসা সবিস্ময়ে বনলতা আবিষ্কার করিল—সে আর নির্জ্জনে বসিয়া নাই।

একটি ছোট ছেলে বনলতার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে। এত দুঃখেও বনলতার হাসি আসিল—

ছোট ছেলেটিই পরিচয়ার্থে প্রথমে প্রশ্ন করিল—তুমি কাঁদছিলে কেন?

প্রথমটা বনলতা কথা কহিতে পারিল না, ছেলেটি খুবই ছোট—ছয় সাত বছরের বেশী তাহার বয়স নয়, পরিধানে মলিন হাফপ্যাণ্ট—খালি গা। হাফপ্যাণ্ট হয়ত তাহার দাদার হইবে, কারণ সেটি ঢিলা পা-জামায় দাঁড়াইয়াছে। মাথার চুলগুলি অবিন্যস্ত রুক্ষ, কিন্তু এত অপরিচ্ছন্ন তাহার বেশভূষা হইলেও মুখে একটা তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছাপ বর্ত্তমান।

বনলতা সস্নেহে কহিল—কাঁদিনি বাবা, আপন মনে কথা কইছিলাম। তুমি কখনও আপনার মনে কথা কও না?

পিছন দিকে হাত দুটি সংযুক্ত করিয়া গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া ছেলেটি সপ্রতিভের মত জানাইল এ কার্য্যে সে অনভ্যস্ত নয়।

বনলতা প্রশ্ন করিল—কিন্তু তুমি কোথায় থাকো? দাদার প্যাণ্ট পরেছ ত' দেখছি।

কথাটি বলিয়া বনলতা নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িল। আজিকার দিনে যাহার বেশভূষার এমন দৈন্য, তাহার পোষাক সম্বন্ধে মন্তব্য করা ঠিক হয় নাই।

ছেলেটি বলিল দাদা নেই ত' আমার। ওরা দিয়েছে।

—ওরা কারা?

—আমি যেখানে থাকি! আশ্রমের লোকেরা।

—আশ্রম! তুমি কি অনাথ আশ্রমে থাকো?

—হ্যাঁ।

—আর সব ছেলেরা কোথায়, তারা আসেনি?

—তারা হালদারদের বাড়ী গেছে, আমি দুষ্টুমি করেছিলুম কিনা আমায় তাই নিয়ে যায়নি, আমি আরতি দেখবো বলে পালিয়ে এসেছি।

—ওদের ওখানে অনেক লোক না—? তোমার হালদারদের বাড়ী যেতে ইচ্ছে করে না!

—ওদের ওখানে আমরা ত' গেল বছর গিয়েছি, তোমার ঠাকুর দেখবারই আমার ইচ্ছে ছিল। ওদের ওখানে অনেক লোক, দুশো—পাঁচশো—হাজার হাজার।

বনলতা কহিল—এস বাবা, তোমায় প্রসাদ দেব। বনলতার শূন্য-মনে আজ খুসীর প্লাবন বহিতেছে। এই তার একমাত্র অতিথি, অনাহুত অতিথির অতিথ্যের ত্রুটি সে কিছুতেই হইতে দিবে না।

প্রসাদ খাইতে খাইতে সহসা ছেলেটি বলিয়া উঠিল—ঐ রে' ঘণ্টা বাজলো আমি এবার চল্লুম!

বনলতা কহিল—কেন বাবা!

—ওরা এখনই ফিরবে, আমায় না পেলে খুব মারবে।

বনলতা লটারির বাজী জিতিয়াছে, সে প্রসন্ন মনে কহিল—

তোমাকে আর ওখানে ফিরে যেতে হবে না। আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে। এই তোমার বাড়ী।

বালক কিছুই বুঝিল না—বনলতা তাহাকে সজোরে বুকে চাপিয়া ধরিল।

আবার আগামী কাল

কারাগারের লৌহ-কপাট যে-রূঢ় ভঙ্গীতে সহসা মুখের উপর বন্ধ হইয়া যায়, অপরেশের মনে হইল তাহার মুখের উপর কোনো অদৃশ্য দরজা তেমনই সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল। লৌহের সুতীব্র ঝন্‌ঝনায় অপরেশের কল্পনা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সমাপ্তির শ্রান্তিকর স্বর !

এক সপ্তাহ ধরিয়া অপরেশ শুধু ভাবিয়াছে, দারুণ উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিয়া গিয়াছে, কল্পনা ও সম্ভাবনায় মিশিয়া সেই চিন্তা-সূত্রের এক ভয়াল-মূর্ত্তি মনে ফুটিয়া উঠিতেছে।

জানালার ধারে দাঁড়াইয়া অপরেশ পথ-জনতার কর্ম্ম-কোলাহল মুখরিত বিচিত্র গতি-ভঙ্গিমার দিকে তন্ময় হইয়া চাহিয়া আছে।

পৃথিবী হইতে অপরেশ বহিষ্কৃত, জগতে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

অপরেশের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল—উন্মাদের হাসি, শূন্যমনের অর্থহীন অভিব্যক্তি !

অফিস-ঘরের এই মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা স্যর তারানাথকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। অপরেশের অফিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে। বাজার গুজব, কানাকানি এবং ভিতরকার সকল সংবাদ জানার পর অপরেশের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখা কঠিন। বিশেষতঃ বন্ধু যখন বিপদ-জড়িত তখন সে বন্ধুকে শতহস্তেন রাখাই ধনীর যোগ্য কাজ। অবশ্য অপরেশের এই অবস্থার জন্য তিনি দুঃখিত, আন্তরিক দুঃখিত, কিন্তু

উপায় কি ? নিজের সম্মান, নিজের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য সর্ব্বাগ্রে রাখিতে হইবে। এই সময় অপরেশের সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিলে 'সুগার কম্বাইনে'র সহিত স্যর তারানাথের যে-সব কথা-বার্ত্তা চলিতেছে তাহাতে বাধা পড়িবে। তিনি অপরেশের বন্ধু, লোকে ছুটিবে তাঁহার কাছে একটু সংবাদের আশায়। সবই তিনি জানেন, গুজবও তাঁহার অজ্ঞাত নয়। হয়ত তাঁহাকে মিথ্যা বলিতে হইবে, কিম্বা আসল কথা তিনি ফাঁস করিয়া দিতেও পারেন। এ-সব অবস্থা তাঁহার পক্ষে অসহনীয়, অপরেশের সান্নিধ্য এ-সময়ে বর্জ্জন করাই উচিত ছিল, অপরেশ সম্বন্ধে কিছু না জানার ভান অপরেশের পক্ষেও ভালো, তাঁহার পক্ষেও ভালো।

কিন্তু টেলিফোনে অপরেশ তাঁহাকে অতর্কিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিয়াছে ও অফিসে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে। রাজী না হওয়া ছাড়া আর কি উপায় আছে ? এমনও ত' হইতে পারে আসল অবস্থা গুজব হইতে অনেক ভালো। তিনি ত' আর সঠিক জানেন না, আর কে-ই বা জানে ? তা-ছাড়া যদি অপরেশ এই বিপদ কাটাইয়া আবার নূতন করিয়া দাঁড়ায়—তখন— ? এই বিপদে তাহাকে অবহেলা করার জন্য তখন হয়ত অনুশোচনা করিতে হইবে।

কাজেই স্যর তারানাথকে অপরেশের অনুরোধে রাজী হইতে হইয়াছে।

স্যর তারানাথ আসিয়াছেন, বন্ধুত্বের বাহু তাঁর প্রসারিত। তারপর গভীর মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিয়াছেন এবং গভীরতর দুঃখের সহিত সমবেদনা ও অক্ষমতা জানাইয়াছেন।

আন্তরিকতার সুরে তিনি কহিলেন—যদি তুমি আমাকে আগে জানাতে ভাই, এখন আমার যা অবস্থা, নতুন 'কন্ট্রাক্ট' হাতে নিয়েছি। ওঃ! তোমার এই বিপদ! নতুন ত' তোমাকে কিছু বলবার নেই, কিন্তু আমি কি করবো? কোনো উপায় নেই ভাই, কোনো উপায় নেই। আমার শক্তিতে কুলালে এ-বিপদ তোমার কাটিয়ে দিতুম।

গভীর নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে অপরেশ হাত দু'টি একবার উপরে তুলিয় ধীরে-ধীরে কোলের উপর নামাইলেন।

যদি সম্ভব হইত......

অপরেশের মুখ বরফের মতো শাদা হইয়া গিয়াছে। দেহে যেন তার প্রাণ নাই, পাথরে এইমাত্র তাহার মূর্ত্তিটি গড়া হইয়াছে। স্তব্ধা অপরেশ—নিঃশব্দে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এ-অবস্থায় বসিয়া থাকা স্যর তারানাথের পক্ষে অসহ্য, তাঁহাকে উঠিতে হইবে, কিন্তু কি ভাবে ওঠা যায়!

অসহায় অবস্থা জানাইবার জন্য স্যর তারানাথ কণ্ঠে যথেষ্ট আবেগ মিশাইয়া আবার বলিলেন—পঞ্চাশ হাজার তোমার দরকার, আগে জানলে 'সুগার কম্বাইনে' অত টাকা ঢালতুম না। তোমাকেও আজ এই টাকার জন্য ভাবতে হ'ত না। এ ত' আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

কিন্তু শ্রোতার কোনো আগ্রহ না থাকায় বক্তাকে থামিতে হইল।

অবস্থা যে সঙ্গীন, তাহা স্যর তারানাথ অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু এতদূর তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। অপরেশ

তাঁহাকে সকল কথাই খুলিয়া বলিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার তাহার ঋণ-সমুদ্রে কিছুই নয়।

অপরেশের অর্থ ছিল, সুনাম ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, বুদ্ধি ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ এ কি! 'সুগার কম্বাইনে'র কথা সহসা তাঁহার মনে হইল। নিজের অবস্থাও আজ ভাবিয়া দেখিবার। এইখানে সামান্য ভুল, ঐখানে এতটুকু ভুল হিসাব, এখানে বিশ্বাসহীনতা, ওখানে দুর্ব্বলতা, আজিকার সতর্ক সিদ্ধান্ত আগামীকল্যের উচ্ছৃঙ্খলতা—এই সব মিলাইয়াই ত' ব্যবসা! সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চল চরণ সর্ব্বদাই শূন্যে রহিয়াছে। একবার এইখানে স্পর্শ পড়িতে-না-পড়িতেই আবার কোথায় উধাও।

ঈশ্বরের কৃপায় স্যর তারানাথের অবস্থা এতদূর গড়ায় নাই। অপরেশ আজ পঞ্চাশ হাজার চায় কিন্তু দশ লক্ষেও কি সে বাঁচিবে? তাঁহাকে টাকা দেওয়া মানে তাহা জলে ফেলিয়া দেওয়া। মানুষের দুর্দ্দিন যেমন সহসা আবির্ভূত হয়, তেমনই হঠাৎ ত' আর চলিয়া যায় না। এখন তাহাকে টাকা দেওয়ার মতো দুঃসাহসিকতা আর কি আছে? বন্ধুত্ব কথাটি শুনিতে বেশ, হয়ত শ্রদ্ধারও উদ্রেক করে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারও ত' কম শ্রদ্ধার উদ্রেক করে না।

তা ছাড়া আশু বিশ্বাস, উমেশ আঢ্য—এরা ত' স্যর তারানাথের চেয়ে বড় মহাজন, অপরেশের সহিত মাখামাখি তাঁহাদের কিছু কম নয়, কিম্বা, হীরালাল শীল, মতিচাঁদ হীরাচাঁদ, সকলেই ত' ধন-কুবের।

অপরেশ সেই সব জায়গায় চেষ্টা দেখুক না কেন?

তাঁহার পক্ষে এ আবদার রক্ষা করা অসম্ভব। অপরেশের আরও কাকুতি ও কাতরতা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে স্যর তারানাথ

এই সব কথা ভাবিতেছিলেন। অপরেশ গাম্ভীর্য্য-ভরা চিন্তা-কাতর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নিজেকে লজ্জিত বোধ করিতেছেন। কিছুকাল আগে এমনই এক বিপদে অপরেশের কাছে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল, অপরেশও বিনা দ্বিধায় সেদিন অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সামান্য টাকা—মাত্র বিশহাজার!

কি ভাবে ও কত শীঘ্র এই ঘর ত্যাগ করা যায়, স্যর তারানাথ সেই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অপরেশ হঠাৎ উন্মাদের মতো হাসিয়া উঠিল।

অপরেশের হাসি স্যর তারানাথের কানে কর্কশ ও কঠিন হইয়া বাজিল। অপরেশ উন্মাদ হইল না কি! ব্যবসা ব্যতীত অন্য কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপারে তাঁহার বড় ভয়। অপরেশ যদি এখন কিছু করিয়া বসে? স্যর তারানাথ সহসা 'রিষ্ট ওয়াচের'র দিকে চাহিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন, তারপর একবার একটু কাশিয়া কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—তা হ'লে চলি এখন, আবার ছটায় একটা appointment আছে, একেবারে ভুলে গিছ্‌লুম। কিছু ভেব না ভাই, উপায় একটা হবেই, don't worry, something may turn up।

বলিবার সময় তিনি অপরেশের মুখের দিকে লক্ষ্য করেন নাই, এখন চোখ পড়িতে সে যে তাঁহার কথা কিছু শুনে নাই, তাহা বেশ বোঝা গেল।

স্যর তারানাথ ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অপরেশের সেক্রেটারী সারদা রায় তারানাথের যাওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল। অপরেশের অবস্থা সারদা ভালোই জানে। সারদা চাকরির কথা ভাবিতেছিল, আজিকার দিনে এমন একটি চাকরি সংগ্রহ

করা সহজ নয়। অপরেশ চৌধুরীর ভাগ্যসূত্রও সারদার সহিত জড়িত। অদৃষ্টের উপর কাহারও হাত নাই, নিজের অদৃষ্টে সারদা দুঃখিত কিন্তু অপরেশ চৌধুরীর জন্যও সে আন্তরিক দুঃখিত। অপরেশের কাছে শুধু যে মোটা মাহিনা আর ভালো ব্যবহার পাইয়াছে তাহা নয়, চৌধুরীর স্নেহশীলতাও সকলের অন্তরকে স্পর্শ করে।

চৌধুরী নিজের অভিজ্ঞতা সকলকে জানাইতেন, হাতে-কলমে কাজ শিখানোই ছিল তাঁহার অভ্যাস। চৌধুরী বলিতেন—সারাজীবন তুমি আমার সেক্রেটারী থাক্‌বে না কি সারদা? নিজের উন্নতির দিকে আগে লক্ষ্য রাখবে। আমার সব কাজে চোখ রাখ্‌লেই কাজ শিখ্‌বে, আমার ভুলেও শিক্ষা লাভ করবে, আবার আমার সাফল্যেও তোমার জ্ঞান বাড়বে। আমার যা অভিজ্ঞতা, আমার যা জ্ঞান তা দিয়ে সর্ব্বদাই তোমাদের আমি সাহায্য করবো! বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, উন্নতির চেষ্টা করো হে, বুঝ্‌লে, সারদা? উন্নতির চেষ্টা করো।

এখন তারানাথকে যাইতে দেখিয়া সারদা অনুচ্চস্বরে কহিল—Another rat leaving the sinking ship.

চৌধুরী বলিতেন—ভুলের দিকে লক্ষ্য রেখো।

সারদা হইলে কখনই স্যর তারানাথকে ডাকিত না। সারদা জানে, ইহার দ্বারা উপকার অসম্ভব।

সারদা উন্নতির চেষ্টা করিবে না-কি!

পরিচিত কণ্ঠে অপরেশ শিহরিয়া উঠিল, তারানাথ তাহা হইলে

চলিয়া গিয়াছে। সারদাও যাইতে চায়। যাইবে বই কি, কিছুরই প্রয়োজন আজ আর নাই।

সারদা কহিল—কাল সকালে কি দরকার আছে কিছু?

কাল সকাল?

অপরেশের কানে 'কাল সকাল' কথাটি বজ্রপতনের মতো শোনাইল। কাল সকালে অপরেশের কি অবস্থা, কোথায় তাহার স্থান!

অতিকষ্টে অপরেশ কহিল—কা ল স কা ল? জানো সারদা, কাজ-কর্ম্মের অবস্থা বড় ভালো নয়, কি যে করা যায়—

অপরেশ আর বলিতে পারিল না চোখের জলে গলার স্বর বন্ধ হইয়া গেল। কি-ই বা আর বলিবার আছে!

সারদা কহিল—তা'হলে এখন আসি?

অপরেশ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

অফিসের কোলাহল কমিয়াছে।

অপরেশ বুঝিল অফিসের সকলেই বোধহয় এতক্ষণে চলিয়া গিয়া থাকিবে। কেরাণী, টাইপিষ্ট, চাপরাশী—সকলেই হয়ত চলিয়া গিয়াছে। বাহিরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, হয়ত সাতটা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘড়ির দিকে চাহিবার উৎসাহ অপরেশের নাই। হ্যাটটি মাথায় তুলিয়াও অপরেশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এই ঘর ছাড়িতে তাহার মায়া হইতেছিল।

এই ঘরেই তাহার জীবনের কুড়িটি বছর কাটিয়া গিয়াছে, সকাল হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই ঘরে কাজ করিয়া কাটিয়াছে। এই খানেই সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চরণ-স্পর্শ পড়িয়াছে, আবার এইখানেই সে কপর্দ্দকহীন

নিঃসম্বল হইয়া গেল। কিন্তু গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণে বাগানে বসিলে যেমন মধ্য-রাত্রির শীতল হাওয়া অঙ্গে না-লাগা পর্য্যন্ত উঠিতে ইচ্ছা করে না, অপরেশেরও তেমনই এ ঘর ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না।

জানালার কাছে আর্ম্ম চেয়ার সরাইয়া অপরেশ চুপ করিয়া বসিল। এইখান হইতে ওয়াটস্-এর আঁকা 'আশা' ছবিখানি ভালো করিয়া দেখা যায়। এখন অন্ধকারে ছবিখানি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না, তবু ছবিটির সমস্ত টুকুই অপরেশের মুখস্থ। কুহকিনী আশা নানা ভাবের, নানারকমে স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করিয়া চলিয়াছে আজ প্রায় পনের বৎসর ছবিটী ঐ ভাবেই ঐখানে টাঙানো আছে, এখন কোনও ভাগ্য-বান্ হয়ত আর সব আসবাবের সহিত নিলামে ছবিটিও কিনিয়া লইবে।

অপরেশ এখন চায় শান্তি, এতটুকু বিশ্রাম। এই চেয়ারে মাথা রাখিয়া যদি সে একটু বিশ্রাম করিতে পারিত! শান্তি, বিস্মৃতির কোলে দীর্ঘ বিশ্রাম, যদি সম্ভব হইত!

তারপর ঘনায়মান ছায়ায় ধীরে ধীরে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ! মৃত্যু...

এখন তাহার যাইবার স্থান কোথায়? অপরেশ বৃদ্ধ, অর্থহীন, সহায়হীন, সঙ্গীহীন এবং শ্রান্ত।

মৃত্যু—নিঃশব্দে মৃত্যুর স্নেহময় নীড়! প্রভাত-রবি-রশ্মি পৃথিবী স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে, সৌভাগ্য শিখর-চূড়া চূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি—যদি সে মরিতে পারিত!

অপরেশ একটু ইতস্ততঃ করিতেছে, এদিকে চিন্তা ধীরে ধীরে কল্পনার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

সহসা সে আলোকিত করিডোরে বাহির হইয়া পড়িল।

অপরেশ লিফ্‌ট চালকের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে, কাজেই তাহার

সেলামে হুজুরের উত্তর মিলিল না। অপরেশের মাথায় তখন একটি মাত্র চিন্তা কাহারও দিকে লক্ষ্য করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার নাই।

অপরেশ পেভমেণ্ট-এ পৌঁছিল।

মন্নুলাল গাড়ীর দরজা খুলিয়া লম্বা সেলাম ঠুকিল। গাড়ীর কথাও অপরেশের মনে ছিল না। ঘন সবুজ রঙের ডেমলারের সাদর আহ্বানে আজ আর অপরেশ সাড়া দিবে না। প্রতি সন্ধ্যায় 'লেকে' বেড়াইয়া, সিনেমা বা ক্লাবে ঘুরিয়া তাহার এই সময়টুকু কাটিত। আজ আর বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, প্রতিদিনকার সে নিয়ম আজ আর নাই। ওয়াট্‌স-এর ছবিরও যা দুর্দ্দশা, ডেম্‌লারেরও সেই অবস্থা!

দেউলিয়ার আবার সম্পত্তি!

গাড়ীতে উঠিতে যাইয়া মনে হইল—মন্নু সিং যদি তাহার গন্তব্য স্থানের কথা বলিয়া দেয়—পুলিশ দুই আর দুই-এ চার মিলাইবে। প্রয়োজন নাই।

অপরেশ কহিল—মন্নু, আজ আর গাড়ীর দরকার নেই। তুমি বাবা বাড়ী ফিরে যাও।

মন্নু সেলাম জানাইল।

মন্নু লোকটি ভালো, বাজে কথা কয় না, অনাবশ্যক কৌতূহল নাই। বেশ লোক। কিছু দিতে পারিলে ভালো হইত। সহসা মনে পড়িল পকেটে ত' এখনও কিছু টাকা আছে। অপরেশ একটি পাঁচ টাকার নোট মন্নুর হাতে দিয়া বলিল—বখশিস্।

মন্নু কহিল—সেলাম হুজুর।

কিছুদূর যাইয়া অপরেশ একটি ট্যাক্সিতে উঠিল।

বরানগরের হেরম্ব ডাক্তার অপরেশের সহপাঠী। প্রেসিডেন্সীতে একদা হেরম্বের সুনাম ছিল। তারপর অবশ্য হেরম্বের নানা প্রকারের দুর্নাম ও সে মদ্যপ বলিয়া বন্ধু-বান্ধব তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত না, আর হেরম্বও জীবনে বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। অপরেশ মধ্যে মধ্যে হেরম্বকে অর্থ-সাহায্য করিয়াছে (অবশ্য ঋণ-শোধ করা এবং মদের খরচ দেওয়াকে যদি সাহায্য বলা যায়)। মাত্র একমাস আগে হেরম্বকে প্রায় একশো টাকা দিতে হইয়াছে। আজ সে আসিয়াছে হেরম্বর কাছে সাহায্যের জন্য, তবে এ সাহায্য অর্থ-সাহায্য নয়।

হেরম্বের বাড়িটি কি বিশ্রী নোংরা, যেমন জঘন্য পল্লী, তেমনই অপরিচ্ছন্ন ঘর-দোর। হেরম্বের এত শত দেখিবার সময় কোথায়! এই সব লক্ষ্য করিবার মতো সময় বা মন অপরেশের নাই, হেরম্বের চোখের দিকে চাহিয়া অপরেশ বুঝিল সে এখনও প্রকৃতিস্থ আছে।

অপরেশের অকস্মাৎ আবির্ভাবে হেরম্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে, অপরেশ চৌধুরী স্বয়ং তাহার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত, হেরম্ব কি করিলে তাহার যথাযোগ্য সমাদর করা হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

একটি ভাঙা চেয়ার আগাইয়া লইয়া অপরেশ ইতিমধ্যেই বসিয়া পড়িয়াছে। হেরম্বকে কি বলিবে তাহা সে সারা পথ মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এখন বিনা ভূমিকায় কহিল—হেরম্ব, তোমার অনেক উপকার করেছি, এখন আমার একটু উপকার তোমায় করতে হবে। গোটাকুড়ি কুকুর মারবার উপযুক্ত মর্ফিয়া তোমাকে সংগ্রহ করে দিতে হবে। আমার বিশেষ দরকার। নতুন একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট—

হেরম্ব বুঝিতে পারিল না, অপরেশের মুখের দিকে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার দেহের মতো মনেরও

ছিল মন্থর গতি। অপরেশ তাহার বাড়ীতে আসিয়াছে, কেন না কুড়িটা কুকুর মারিবার যোগ্য মর্ফিয়া চাই। কুড়িটা কুকুর!

বিস্ময়ের মুহূর্ত্ত কাটাইয়া বোকার মতো হেরম্ব প্রশ্ন করিল—কুড়িটা কুকুর! কেন বলো ত'?

অনিবার্য্য প্রশ্ন! অনিবার্য্য, স্থতরাং অসহ্য! অপরেশের মেজাজ চড়িয়া গেল। মাতাল, নির্ব্বোধ, অপরিচ্ছন্ন হেরম্ব আবার প্রশ্ন করিতেছে! অপরেশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়া বসিল, কহিল—বল্লুম ত' তোমাকে কুড়িটা কুকুর—আর কি শুন্‌বে?

অপরেশকে রাগিতে দেখিয়া হেরম্ব আরো আশ্চর্য্য হইল, বুঝিল প্রশ্ন অবাঞ্ছনীয়, কিন্তু অপরেশও রাগিতে শিখিয়াছে। মাথা চুলকাইয়া মুখ বিকৃত করিয়া হেরম্ব কহিল—হ্যাঁ, তা ত' বটেই।

কিন্তু এ তাহার শূন্য মনের উত্তর। অপরেশের মুখের ও চোখের দৃষ্টি হেরম্বের কাছে দুর্ব্বোধ্য নয়, অপরেশের চোখে রোগীর, আর্ত্তের, বিপন্ন অসহায় দৃষ্টি। হেরম্বকে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে দেখিয়া অপরেশ আবার সরোষে কহিল—কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, আমার আবার অনেক কাজ আছে, শীগ্‌গির দাও।

অপরেশকে হেরম্ব চিরদিন ভয় করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিরক্তিতে সে নড়িল। কহিল—এই যে দিচ্ছি ভাই, একটু সবুর কর।

অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন পাশের ঘরে হেরম্ব মর্ফিয়ার সন্ধানে গেল। মর্ফিয়া—কুড়িটা কুকুর মারিবার উপযুক্ত মর্ফিয়া—অপরেশ আসিয়াছে মর্ফিয়া লইতে। আশ্চর্য্য!

অনেক খুঁজিয়া অবশেষে মর্ফিয়ার বোতল পাওয়া গেল। ধূলা ঝাড়িয়া হেরম্ব আলোর দিকে বোতলটি তুলিয়া দেখিল কতখানি

মর্ফিয়া আছে। কুড়িটা কুকুর! তারপর হাইপোডারমিক্ সিরিঞ্জ (তাও অপরেশের নিশ্চয়ই দরকার), হেরম্ব আপন মনে কহিল— Twenty dogs, twenty fiddlesticks। অপরেশ খাসা গল্পটি বানাইয়াছে।

সিরিঞ্জ ও মর্ফিয়া প্যাক করিতে করিতে হেরম্ব ভাবিতে লাগিল। কুড়িটা কুকুর! হায়রে অপরেশও নেশাখোর!

হেরম্ব হাসিল। ধরা পড়িয়াছে শুধু সে, তাহা হইলে হেরম্বর ব্যবসার কি হইবে? যা হইবার হউক, অপরেশই ত' তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, আজ তাহার প্রয়োজনে সে চুপ করিয়া থাকিবে? কিন্তু অপরেশের মতো লোকের নেশা করা অন্যায়।

উপায় নাই হেরম্ব মর্ফিয়ার মোড়কটি অপরেশের হাতে আনিয়া দিল। অপরেশের মুখে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য নাই। অপরেশ, হেরম্বের একমাত্র বন্ধু অপরেশ, তাহারও নেশার জন্য মর্ফিয়ার দরকার।

হেরম্বের মুখের দিকে একবার মাত্র চাহিয়া অপরেশ ট্যাক্সিতে উঠিল।

অন্ধকারে অপরেশের ট্যাক্সি যখন মিলাইয়া গেল, হেরম্বের তখন সহসা মনে হইল, পৃথিবীর সকল আলো যেন অকস্মাৎ একযোগে নিভিয়া গেল। ঘরের দিকে চাহিয়া বাড়িটার কুশ্রী রূপ এই প্রথম তাহার চোখে আঘাতের মত লাগিল। হেরম্ব বুঝিল, এই সমস্তই তাহার কুশ্রী জীবনের প্রতীক। বাড়ীতে সুন্দর, সত্য বা আনন্দের কিছুই নাই। কিন্তু সব কিছু ছাড়াইয়া হেরম্বের মনে কেবলই একটি সুর অনুরণিত হইতে লাগিল—অপরেশ নেশাখোর!

শক্তিহীন হাতে মাথাটিতে একবার ঝাঁকানি দিয়া হেরম্ব—বাড়ি, অপরেশ, ভবিষ্যৎ—সমস্ত ভুলিবার জন্য চোখ বন্ধ করিল। ভাবিয়া কি হইবে, শুধু ভাবিয়া কখনও কাহার উপকার করা যায় নাই। বার-এ যাইয়া বরঞ্চ সন্ধ্যাটি উপভোগ করিয়া আসা যাক্। সুরার মাদকতায় সবই ভুলিতে পারা যায়।

মলিন সার্টের উপর ছিন্ন সিল্কের চাদরটি জড়াইয়া হেরম্ব পথে বাহির হইল।

হেরম্ব স্বভাবতঃ গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া চলিত। কাহারও সহিত বেশী কথাবার্ত্তা কহা তাহার স্বভাব ছিল না। সেদিন কিন্তু 'বার'-এ যাইবার পথে 'বাস'-এ তাহার এ-গাম্ভীর্য্য আর রাখা গেল না। সাম্নের সীটের দুইটি ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তার টুকরা কানে আসিতে হেরম্ব আগ্রহ ভরে তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল।

—অপরেশ চৌধুরীর কারবার বোধহয় লিকুইডেসনে গেল. লোকটি বড় ভালো ছিল হে!

বক্তার বেশ গোলগাল শহুরে চেহারা, হয়ত কোনও ছোটখাট কোম্পানীর মালিক হইবেন, শ্রোতাটি বোধহয় মোসাহেব নয় ত দালাল, তেমনই শীর্ণ চেহারা।

শ্রোতা কহিলেন—কি বল্লে? অপরেশ? নামটি যেন চেনা ঠেক্‌ছে, কিসের কারবার?

—অপরেশ চৌধুরীর নাম শোনো নি? নিশ্চয়ই শুনেছ, মস্ত ধনী লোক, যুদ্ধের পর সেই Land Develoment Scheme-এ অনেক টাকা করেছিল। শুনেছ বৈ কি।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, শুনেছি বটে, তা তাদের ত' অনেক টাকা, কিসে গেল বলো ত'! সত্যি ত'?

—সত্যি না ত' কি, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত আজ বাদে কাল জানাজানি হয়ে যাবে, আমি আয্য-কোম্পানীর উমেশবাবুর কাছে শুন্‌লুম।

হেরম্বের সারা শরীরে আগুন লাগিয়াছে। অপরেশ চৌধুরী! তাহার যেন কথা কহিবার শক্তি সহসা লুপ্ত হইয়া গেল। হয়ত এ অন্যলোক, কিন্তু এঁরা ত' স্পষ্টই বলিলেন—অপরেশ চৌধুরী। হেরম্ব স্থির থাকিতে পারিল না, বিনীত কণ্ঠে কহিল—মাফ্ কর্‌বেন স্যার, আপনাদের কথাবর্ত্তা একটু শুনে ফেলেছি, কিন্তু আপনারা কোন অপরেশ চৌধুরীর কথা বল্‌ছেন? কিছু ভুল হয়নি তো?

মোটা ভদ্রলোকটি পিছনে মুখ ফিরাইয়া তাচ্ছিল্যভরে হেরম্বের দিকে একবার চাহিলেন। হেরম্বের কুশ্রী চেহারা ও অপরিচ্ছন্ন বেশ-ভূষার সহিত এই প্রশ্ন খাপ খায় না, বিস্মিত হইবার কথা, কহিলেন—অপরেশ চৌধুরী আর ক'টা আছে মশাই? ভুল হয় নি কিছু, তবে ভুল হ'লেই ভালো হ'ত, চৌধুরী ম'শায়ের মতো লোক আজকাল বড় দেখা যায় না।

হেরম্ব উত্তর করিল না। তাহার মৌনতায় বিস্মিত হইয়া মোটা লোকটি সহচরকে অর্থসূচক ভঙ্গীতে ইশারা করিলেন আর বিস্ময়ের মাত্রা বাড়াইয়া হঠাৎ 'বুঝেচি' বলিয়াই হেরম্ব সেই চল্‌তি 'বাস' হইতে নামিয়া পড়িল।

অপরেশ শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়া শূন্য মনে জনতার দিকে

চাহিয়া আছে। এখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে, বাড়ীর সকলেই ত' এখনও জাগিয়া আছে। গিন্নি হয়ত সুজাতাকে লইয়া ডেম্‌লারে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। সংযুক্তা এখনও জানে না, তাহার কি দিন আসিবে, সে একটু বিলাসিতা ভালোবাসে, তাহার-ই কষ্ট বেশী হইবে। সংযুক্তা অপরেশের প্রতি চিরদিনই উদাসীন, অপরেশের অপরাধ, সে চিরদিনই ব্যবসা ব্যতীত আর কিছুতে মন দিতে পারে নাই, (অন্ততঃ অপরেশের তাই ধারণা)। এখন অপরেশের সময় কাটে কি করিয়া। ডবল্ ডেকারের তলায় পড়িলে বেশ স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, হেরম্বের সহিত দেখা করিবার কি-ই বা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পথ অতিক্রম করিবার সময় অপরেশ পুত্রের মতো স্নেহে মর্ফিয়ার মোড়কটি আঁকড়াইয়া রহিল। অপরেশ ভদ্রলোক—সে ভদ্রলোকের মতোই ঘরে বসিয়া মরিবে, কুকুর-বিড়ালের ন্যায় পথে মরিবার মতো অগৌরব আর কি আছে? মৃত্যুরও আভিজাত্য আছে।

কলিকাতার পথ-জনতা কত বাড়িয়া গিয়াছে, রাত্রি নয়টা বাজে, তবু জনস্রোতের বিরাম নাই। কত লোক, কত গাড়ী। এত ধনীও কলিকাতায় আছে। অপরেশ টুপির আড়ালে পরিচিত লোকের দৃষ্টি এড়াইবার চেষ্টা করিল। ভিড়ের মধ্যে এ উহার গায়ে পড়িতেছে, ধাক্কা দিতেছে এবং মার্জ্জনা ভিক্ষার পূর্ব্বেই সরিয়া যাইতেছে, মানুষ—কতই না মানুষ আছে জগতে, এ উহার গায়ে পড়িয়া অস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া তুলিতেছে, শুধু বাঁচিবার জন্যই ত' এত, বাঁচিবার আবার বাসনা, কি নির্ব্বোধ আকাঙ্ক্ষা!

অপরেশ সহসা একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়া কহিল—চালাও ষ্ট্র্যাণ্ড্।

আজ সে জীবন দেখিবে, মৃত্যুর অপরূপ আস্বাদ জীবনে।

অপরেশ প্রিন্সেপ ঘাটে নামিল।

কী অর্থহীন এই জীবন! যৌবনের উত্তেজনার মাদকতায় হয়ত উন্মাদনা জাগায়, কিন্তু মধ্য বয়সের ক্লান্তিকর বৈচিত্র্য-হীনতা--দিনের পর দিন কাটিয়া যায় সুখের সন্ধানে, এতটুকু সুখ, এতটুকু শান্তি—এই লইয়াই ত' জীবন, দুঃখের অথৈ পাথারে কয়জন সাঁতরাইতে পারিয়াছে! তরুণ যাহারা তাহারাই চায় সুখ, সুখের সন্ধানে তাহারাই চিরদিন ঘুরিবে, অবশিষ্ট লোক স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় চায় বিস্মৃতি! বিস্মৃতির কোলে এতটুকু বিশ্রাম! জীবনের সকল পথই সমান, সকলেরই সমাপ্তি বিস্মৃতিতে। বাঁচিবার একমাত্র উপায় বিস্মৃতি, নতুবা জীবনের শূন্যতা উন্মাদ করিয়া দিবে। এতদিন অপরেশ জীবনকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে, অর্থ নষ্ট করিয়াছে, সাফল্যে পাইয়াছে শান্তি, অসাফল্যে আঘাত। আজ জীবনের সেই যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে, শীষ্-মহালের সৌখীন আবরণ আজ চূর্ণ, জীবনের পটভূমি আজ শূন্যতায় পূর্ণ। আজ অপরেশ বৃদ্ধ, আজ সে অর্থহীন সুতরাং তাহার জীবনও অর্থহীন।

সাফল্যে যে-জীবনের সূচনা, অসাফল্যের অগৌরবে তাহার সমাপ্তি। কিশোর বা সুজাতার যাহা হয় একটা ব্যবস্থা হইবেই, গৃহিনীর বিলাস-ব্যসনে বাধা পড়িবে। অসুবিধা সকলেরই কিছু না কিছু হইবে। কিন্তু উপায় নাই। কোনও উপায় নাই।

অপরেশ মরিবেই, আজ সে মরিয়া বাঁচিবে।

এতক্ষণে হয় ত' সকলে ঘুমাইয়া থাকিবে। নিঃশব্দে বাড়িতে

প্রবেশ করিলেই, অপরেশের বাসনা পূর্ণ হইবে। দীর্ঘ সন্ধ্যাটি এই একটি চিন্তায় কাটিয়া গিয়াছে।

ষ্ট্র্যাণ্ড-এর ভিড় এতক্ষণে কমিল, দু'একজন প্রেমিক-প্রেমিকা এদিক ওদিকে ঘোরাঘুরি করিতেছে, অপরেশ একটু হাসিয়া বাড়ির পথ ধরিল।

কাল হয়ত বন্ধুরা সহানুভূতি জানাইতে ত্রুটী করিবে না। বহু-লোকে বলিবে, 'অপরেশ চৌধুরীর ভাগ্যে শেষে এই ছিল, আহা!' এইত জগৎ, আশু বিশ্বাস, উমেশ, হীরালাল, তারানাথ—সকলেই অবলীলাক্রমে কেমন মিথ্যা বলিয়া গেল। হীরালাল ত' কাঁদিয়াই ফেলিল, কাহারও একটি পয়সা নাই, যদি কিছু উপায় থাকিত তাহা হইলে কি অপরেশকে ভাবিতে হয়। ঈশ্বর তুমি শুধু জানো তাহার কতটুকু সত্য! অপরেশ প্রায় সকলেরই কোনও-না-কোনো বিপদে সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু কে তাহাকে সাহায্য করিবে? অর্থের শীষ্-মহাল্ চূর্ণ হইলে বন্ধুত্বের মূল্য নাই, জীবনের মূল্য নাই।

অপরেশ সযত্নে মর্ফিয়ার মোড়ক আঁকড়াইয়া ধরিল। জীবনের এই একমাত্র সম্বল, অবলম্বন! অপরেশ চৌধুরীর মৃত্যুতে শোকের কিছুই নাই। সংসারে সে নিঃসঙ্গ, মৃত্যুর আশ্রয়—নীরবতা ও নিভৃতির নিরলা নীড়। সারদার একটু কষ্ট হইবে, তাহার মতো সুশীল ও বুদ্ধিমানের চাকরির আবার অভাব। নিজেই ত' সে নূতন ব্যবসা খুলিতে পারে, তাহার শ্বশুর ধনী বলিয়াই শোনা যায়। কিন্তু কষ্ট হইবে হেরম্ব বেচারার। হেরম্ব যখন সব শুনিবে, হতাশা ও ক্ষোভে বেচারা মরিয়া যাইবে। কিন্তু সে হতাশা নতুন কোনও সাহায্য না পাওয়ার সম্ভাবনায়। হেরম্ব হয়ত শেষবার প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিয়া লইবে।

তারপর...

আর কয়েকটি মিনিটেই অপরেশ বাড়ী পৌছিবে। তারপর বৈঠকখানায় কয়েকটি শান্তিময় মুহূর্ত্ত—তারপর···নিরবচ্ছিন্ন অবসর। অনন্ত শান্তির সম্ভাবনায় অপরেশ পুলকিত হইয়া উঠিল। মফিয়ার মোড়কটি আবার সে সন্তর্পণে আঁকড়াইয়া ধরিল।

আগামীকল্যকার বিভীষিকা নাই, দেউলিয়ার দৈন্য নাই, প্রশ্নের উত্তর নাই, কটূকথা বা বন্ধুদের কটূতর সহানুভূতি নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীর দম্ভ নাই, সংবাদপত্রের আস্ফালন নাই। অপরেশ মুক্ত—দৈন্য, লজ্জা, ভয়, বার্দ্ধক্য—সমস্ত শাস্তির আজ শান্তি!

অপরেশ মুক্ত!

ইহা হয়ত উচিত ছিল না, কাপুরুষের মতো না মরিয়া সৎসাহসের উপর নির্ভর করিয়া একবার দাঁড়াইতে পারিলে বোধকরি ভালো হইত। অপরেশ অনেককে অনেক উপদেশ দিয়াছে, ডেমলার দরজায় দাঁড়াইয়া থাকিলে অনেক কথাই বলা যায়, কিন্তু ডেমলার যখন অন্তর্হিত এবং দরজা যখন অপরের অধিকৃত, তখন?

বৈঠকখানায় তখনও আলো জলিতেছে, অপরেশ বিস্মিত হইল। প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজিয়াছে, এখনও আলো? দেউড়িতেও আলো? ব্যাপার কি? আজ ইহারা উৎসব করবে নাকি?

দেউড়িতে পৌছিতেই রামধারী সবিনয়ে জানাইল—এক ডাংদার বাবু আউর সারদা সাব হুজুরকা লিয়ে ন' বাজেসে বৈঠা হ্যায় হুজুর।

হেরম্ব না-কি? কি আশ্চর্য্য! কিছু চাই হয়ত, কিন্তু সারদা?

প্যাকেটটি সন্তর্পণে লুকাইয়া অপরেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। বাহ্যিক আনন্দ দেখাইবার জন্য অপরেশ খেলো রসিকতা স্রুরু

করিল—এই যে হেরম্ব! সারদাও যে, এত রাত্তিরে কি মনে ক'রে? হেরম্বের বুঝি মালের টাকা নেই?

কিন্তু অপরেশ লক্ষ্য করিল ছু'জনেরই চোখে অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি অশরেশকে সতর্ক হইতে হইবে, তবে কি তাহারা সব ফন্দী ধরিয়া ফেলিয়াছে? তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এতক্ষণ বসিয়া আছে না-কি? কিন্তু তাড়াইবার বা উপায় কি? অপরেশ রাগ করিবে, তাহার সিদ্ধান্তে উহারা বাধা দিবার কে?

সারদা কহিল—দেখুন একটা বড় দরকারে এসেছি, আপনার পরামর্শ ছাড়া কিছু করতে আমার ভরসা হয় না।

ওঃ তাই, সারদা তাহা হইলে পরামর্শ করিতে আসিয়াছে, পরামর্শ দিবার মতোই তাহার মনের অবস্থা বটে। স্বার্থপর ব্রুট্। এই সারদাকেই সে পুত্রাধিক স্নেহে কাজ শিখাইয়াছে, আজ তাহাকে শান্তিতে মরিতে দিবার উপকারটুকু করিতেও তাহারা নারাজ। হায়রে ছুনিয়া—আর হেরম্ব চায় মদের টাকা! বেশ! বিরক্ত অপরেশ কহিল—পরামর্শ? কিসের পরামর্শ? হীরালালের ওখানে না তোমার ডাক পড়েছিল, চাকরি দেবে বল্লে?

সারদা কহিল—সেই জন্যেই ত' আপনার কাছে এলাম। হীরালাল বাবুর চাকরি অবশ্য ভালোই কিন্তু আপনার উপদেশ আমি ভুলিনি, আমার ইচ্ছা—

অপরেশ চোখ বন্ধ করিল। ওঃ—অন্যলোক হইলে সে সহ্য করিতে পারিত না কিন্তু সারদা তাহার বিশেষ স্নেহের পাত্র। কি সাহস! তাহার সহিত অবলীলাক্রমে রাত এগারটার পর—অন্য চাকরি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে আসিয়াছে, স্পর্দ্ধারও একটা সীমা আছে।

অপরেশ কহিল—হুঁ, তারপর ?

—বলতে আমার সাহস হয় না, কিন্তু আপনি আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন বলেই জানি, তাই অনুরোধ করতে সাহসী হচ্ছি, আমার অনুরোধে আপনাকে রাজী হ'তেই হবে।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। সারদার অনুরোধ! বিস্মিত অপরেশ কহিল—কি তোমার অনুরোধ ?

—দেখুন হপ্তাখানেক ধ'রে চেষ্টা করে আমি প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা জোগাড় করেছি,আপনি আবার ব্যবসায় নামুন, আমার অংশীদার হ'য়ে নয়, আমার উপদেষ্টা, আমার মনিব হয়ে আপনাকে নামতে হবে। আমার এ অনুরোধ আপনাকে রাখ্‌তেই হবে। এ আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন না।

—কিন্তু, আমি···আমি তোমার সাহায্য করবো ? আমি কপর্দ্দক-হীন, দেউলিয়া, শক্তিহীন বৃদ্ধ—তোমাকে সাহায্য করবো ? তোমার এ কি পাগলামো, সারদা ?

—পাগলামী নয়, আমার পাশে আপনার উপস্থিতি হবে আমার প্রধান সম্বল, সেই আমার সাহায্য, আপনি শুধু রাজী হোন। টাকা অবশ্য কম, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা কই! আপনার বুদ্ধি, আমার টাকা, আবার আমরা দাঁড়াবো, নতুন করে হবে কোম্পানীর সূচনা।

মুহূর্ত্তে তরুণের উৎসাহের উন্মাদনায় চৌধুরীর প্রাণহীন চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবার অপরেশের মনে আশার আলোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে আবার নতুন আশায়—নতুন উত্তেজনায়, আগামী কালকে অপরেশ দেখিবে নতুন রূপে, নতুন বেশে। দুর্জ্জয় সাহসে আবার অপরেশ জগতের একপাশে এতটুকু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

কিন্তু এই ভাবধারা যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনই, হঠাৎ উধাও হইয়া গেল, অপরেশ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—সারদা তোমার উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ, কিন্তু তা হবার নয়, হবার নয়।

সারদাও ছাড়িবার পাত্র নয়—সে অপরেশকে বুঝাইল, আজ যদি সারদা হীরালালের কাজে যোগ দেয়, তবে সারদার জীবনের মূল্য কি? কোনোদিন কি এই যৌবনের পুনরাবৃত্তি হইবে? সারদা অনভিজ্ঞ অল্পবয়সী, কোথায় তাহার সহায়, কোথায় তাহার সাহস!

সারদা থামিলে অপরেশ শুধু কহিল—আচ্ছা।

সাফল্যের আনন্দে সারদার মন নাচিয়া উঠিল। অপরেশের সম্মতি মিলিয়াছে—আর কি?

কিন্তু অপরেশের 'আচ্ছা' সারদার অনুরোধের উত্তর নয়, তাহার নিজের চিন্তার উত্তর। তাহার জীবন ছিল শূন্য, অর্থহীন, এখন সারদার শ্রদ্ধা ও সৌজন্যে তাহা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সারদা যুবক, সংসারের পথে শিশু, সে তাহাকে সাহায্য করিবে বলিয়া আগাইয়া আসিয়াছে, তাহার অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে অপরেশের হাতে সঁপিয়া দিতেছে—বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, কিসের এ অর্ঘ্য? অথচ এই সারদাকে কয়েক মুহূর্ত্ত আগে সে স্বার্থপর ভাবিয়াছিল!

নূতন রঙে, নূতন রূপে, নূতন দিনের সূর্য্য আবার রঙীন হইয়া উঠিবে। নতুন আশার আলোকে অপরেশের দেহ-মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

আবার আগামী কাল!

অপরেশ এইবার নির্ব্বাক হেরম্বের দিকে চাহিল। বেচারা

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কি তাহার প্রয়োজন, কি সে বলিবে, কে জানে ?

অপরেশ সস্নেহে কহিল—হেরম্ব, তোমার কি দরকার তা ত' বল্লে না ভাই ?

হেরম্ব প্রথমটা উত্তর দিতে পারিল না। তারপর সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আমার প্যাকেটটা ফিরিয়ে দাও। এখুনি আমার সেটা চাই।

অপরেশ কাপুরুষ নয়, অপরেশেরও বন্ধু আছে, সে নিঃসঙ্গ নয়, অসহায় নয়। হেরম্বের দৃঢ়তায়, সারদার শ্রদ্ধায় অপরেশের সারা দেহে আজ পুলক-প্লাবন নামিয়াছে। আবার সে নূতন জীবন দেখিবে।

আবার আগামী কাল !

অপরেশ ধীরে ধীরে মোড়কটি বাহির করিয়া হেরম্বের হাতে তুলিয়া দিল।

সাপ্তাহান্তিক

আবার বসন্ত এলো—উজ্জ্বল মসৃণ বসন্ত! প্রতিটি দিন তার বৈচিত্র্য ও উন্মাদনায় পরিপূর্ণ! স্বপ্নময় বাগান বাড়ীতে আবেশাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে দু'জনের দিন কেটে যায়। যৌবনের প্রাথমিক উন্মেষের সঙ্গে যে-কল্পনার বিলাসিতায় মণিভার মন গড়ে উঠেছে এইবার তার বাস্তব রূপ গড়ে ওঠার সময় হোলো। মণিভা-ই ইন্দ্রজিতের শিল্পীজীবনের প্রেরণা স্ফুলিঙ্গ, নিরুপদ্রিত মণিভা এইবার এই স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপায়িত করবে।

জীবনকে আজ মণিভা পেয়েছে নিজের অধিকারে, আশ্চর্য্য রহস্যময় জীবন, ছবির চেয়ে মনোরম, কামনার অতিরিক্ত। এই মুক্ত জীবন—এর ওপর আর কারো অধিকার নেই, এই ছোট্ট বাড়ীটি আর সুন্দর বাগান, এ যেন জীবনের ছন্দের সঙ্গে বেশ মিলে গেছে। নির্গন্ধী ফুল মণিভার পছন্দ নয়, মরশুমী ফুলের চেয়ে বেশী ভাল লাগে তার মাধবী আর কুন্দ, দোলন চাঁপা আর রজনীগন্ধা; তাই দোকানের ফুলে আর তৃপ্তি হয় না। নিজের হাতে সবৃন্ত রজনীগন্ধা কেটে এনে মণিভা ঘরে এলো, কাশ্মিরী টিপয়ের ওপর খুরজার ফুলদানীতে সেগুলি মনের মত করে সাজালে—বর্ণোজ্জ্বল ফুলের চেয়ে এই তুষার-শুভ্র রজনীগন্ধার রূপ কি কম মনোহর। বিয়ের আগে—মণিভা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলে,

বিয়ের আগে এসব ব্যাপার যে-চোখে সে ভেবেছে, আজ তার পরিবর্ত্তন হয়েছে, দু'মাসেই দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্ত্তন, অতঃপর—

দীর্ঘ অথচ প্রায়ান্ধকার ঘরটি যেন ঘুমিয়ে আছে, জানালার কাঁচ দিয়ে পড়ন্ত রোদ ঘরে আস্‌চে বটে, কিন্তু তাতে মণিভার ঘরের রূপ যেন আরো বেড়ে গেছে। ঘরখানির পেছনে মণিভার সারাদিনই প্রায় কেটে যায়, ইন্দ্রজিতকে বলে এই আমাদের স্বর্গ। ইন্দ্রজিত হেসে বলে স্বর্গ বলেই ত' আমার ভয় করে, কবে আবার বিদায় নিতে হবে, কিছু বরং মর্ত্তের আবহাওয়া থাকা ভালো মণি।

পাশের ঘরেই ইন্দ্রজিতের ষ্টুডিও, সে ঘরে আলো বেশী বটে, কিন্তু ঘরটী আয়তনে ছোট। ইন্দ্রজিতের শিল্পী জীবনের উপাস্য দেবতা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী 'সীজান'। নির্ব্বাক জীবনের ছবিই তাই তার আঁকতে বেশী ভালো লাগে, কিন্তু সাধারণে সে ছবি দেখে আড়ালে হাসে। ইন্দ্রজিতের ধারণা যে মণিভার সৌন্দর্য্যবোধের অমরত্ব রক্ষা করার ক্ষমতা একমাত্র তার-ই আছে।

মণিভার হাতে সর্ব্বদাই কাজ, ঘর সাজানোতে তার সময় বেশী যায়, তার অর্থ এই যে, ঘরের ছোটখাটো জিনিষ-পত্র এদিকে ওদিকে সরিয়ে রাখতেই তার আনন্দ বেশী। আজ যেটি দেখা গেল দক্ষিণদিকে রয়েছে, কাল তা' স্থানান্তরিত। মণিভার মা বল্‌তেন—এ তোর এক ম্যানিয়া, টেবিল চেয়ার নাড়ানাড়ি করে কোন দিন একটা কাণ্ড বাধাবি। মণিভার বাবা জগদীশবাবু কোনো দিন এসব বিষয়ে কথা বলেন না, তবে তাঁর হাসি মণিভার উৎসাহ বাড়িয়ে দেয়।

এতদিনে মণিভা স্বাধীন হয়েছে, এখন সে স্বেচ্ছামত শাড়ী, ব্লাউজ কিনতে পারে, মার মুখের দিকে আর চাইতে হয় না। আধুনিকতম ফ্যাসানের উগ্রতার চেয়ে শান্ত সাধারণ পোযাক-ই মণিভার বেশী পছন্দ, তাই ব্লাউজের বিচিত্রতায় বা শাড়ীর চলমান বলাকা শ্রেণীতে পোযাকের দোকানের বিজ্ঞাপন শোভা পায় না। ইন্দ্রজিতেরও এই পছন্দ, মণিভার সরলতাই তাকে বেশী মুগ্ধ করে। ইন্দ্রজিত একদিন স্পষ্টই বলেছিল আর পাঁচজন ফ্যাসন-নবীশ স্নবের বেশে তোমাকে আমি দেখতে চাই না, আমি চাই সত্যিকার তোমাকে।

কাজেই সে দিন পর্য্যন্ত ছাত্রীর বেশে তাকে যারা দেখেছে আজ তার বিবাহিত জীবন দেখলে অনেকেই হয়ত বিস্ময়াহত হবে। ইন্দ্র-জিতের ইন্দ্রজালে আজ মণিভার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তার প্রকৃত রূপের পূজারী ইন্দ্রজিৎ। মণিভার সব কিছুই ইন্দ্রজিতের ভালো লাগে। মণিভার সাজিয়ে রাখা সব্জি বা ফুল ফলের মধ্যেও যে সৌন্দর্য্য লুকানো আছে তা' কে জানতো। রান্নাঘরের কোথায় সাজানো আছে টম্যাটো, কুমড়ো, সবৃদা—ইন্দ্রজিৎ দেখে বল্লে চমৎকার। ওগুলো সরিয়ো না। আমি একটা স্কেচ করে নিই তাড়াতাড়ি। মণিভা সকালে স্নান করে এসে এলোচুলে হয়তো আলুর খোসা ছাড়াচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ কোথা থেকে এসে তুলির রেখায় অক্ষয় করে রাখলো সেই দৃশ্য। মণিভার রূপ আছে মাধুর্য্য আছে, তার পছন্দ আছে।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও শান্তি নেই। প্রতি শনিবারে কল্‌কাতা থেকে মণিভার মা আর জগদীশবাবু এইখানে এসে রবিবার বিকালে

আবার চলে যান। তাঁদের এই সাপ্তাহান্তিক আগমনে ইন্দ্রজিৎ ও মণিভা বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়ে।

প্রথম শনিবারে মা এসে কার্পেটহীন মেঝে এবং আসবাবের অপ্রাচুর্য্য লক্ষ্য করে বল্লেন—ছিঃ ছিঃ একি করেছিস মণি, লোকে দেখলে বল্‌বে কি? ঝি পচার মা, মার সঙ্গেই থাকে, অনেক দিনের পুরানো লোক, গিন্নীমার হুকুমে তখনই সব নাড়া চাড়া সুরু হয়ে গেল। মণিভা চুপ করে থাকে, যতক্ষণ এঁরা আছেন ততক্ষণ মণিভা কেউ নয়। একেই ছোট বাড়ী, ওরা দু'জন ছাড়া আর একজন মাত্র বাড়তি লোক থাকতে পারে, কাজেই এঁরা এলে এখানকার জিনিষ ওখানে, ওখানকার জিনিষ এখানে নাড়ানাড়ি করতে হয়। ইন্দ্রজিৎ আর মণিভা থাকে ষ্টুডিয়ো ঘরে, কর্ত্তাকে ছেড়ে দিতে হয় হলঘরখানি! এই পরিবর্ত্তনের ফলে বাড়ীর প্রাণশক্তির যেন সাময়িক মৃত্যু ঘটে। প্রতিটি কথা অন্যের কাণে পৌছতে পারে, নব-দম্পতির পক্ষে তা' বিশেষ বাঞ্ছনীয় নয়, তবুও মণিভা মাঝে মাঝে ষ্টুডিয়ো ঘরে এসে যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

ওঁরা এলেই ইন্দ্রজিৎ একবার করে বলে—না, আর কিছু প্রাইভেসী বজায় রাখা গেল না দেখ্‌ছি। মণিভা কিছু বলে না, কিন্তু মনে হয় এ ইন্দ্রজিতের স্বার্থপরের মতন কথা, তার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব চাপানো অন্যায়। ইন্দ্রজিৎ ত এই ষ্টুডিয়ো আশ্রয় করলো—এক খাবার সময় ছাড়া এখান থেকে বেরুবে না, অথচ মণিভার একলার পক্ষে এ কি কঠোর অবস্থা! ওঁদের সব কথাই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে, কারণ ওঁরা যা' বল্‌ছেন সবই ভালোর জন্যে, যদিচ মণিভা বোঝে তাঁরা অভ্রান্ত নন, কিন্তু উপায় কি, এই বাড়ী ওঁরাই যৌতুক দিয়েছেন, এখনো এর পিছনে অর্থব্যয় করছেন। এই উজ্জ্বল বসন্তকাল আর এই বাড়ী, এ

তাঁদেরই দান। তার জন্যে মণিভা মনে মনে কৃতজ্ঞ। ইন্দ্রজিতের শিল্পপ্রতিভার ওপর জগদীশ বাবুর কোনও শ্রদ্ধা নেই। আগামী বোশেখের মধ্যে যদি ছবির কোনও আদর হয় ত ভালোই, নইলে জগদীশ বাবুর লোহার কারবারে ইন্দ্রজিতকে ভর্ত্তি হ'তে হ'বে এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

সাময়িকভাবে মণিভার বাড়ীর ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ অন্তর্হিত হয়েছে, দূরে সরে গেছে ইন্দ্রজিৎ, নিরুদ্দেশ দৃষ্টিতে সে চুপ করে বসে আছে, মণিভা আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে না, বাড়ীতে যেন অখণ্ড স্তব্ধতা নেমেছে। মণিভার ওপর ইন্দ্রজিতের আর যেন সেই উষ্ণ অনুরাগ নেই, তার চাঞ্চল্যময় জীবনে গাম্ভীর্য্যের ছাপ ছড়িয়ে পড়েছে। এ বাড়ীতে ইন্দ্রজিৎ এখন অতিথি।

রবিবার সন্ধ্যায় এঁদের সাপ্তাহান্তিক ভ্রমণ শেষ হোল, সুটকেশ আর টুকীটাকী জিনিষ গাড়ীতে উঠলো। গাড়ী এখনই ছাড়বে, মণিভার মা শেষ মুহূর্ত্তে কতকগুলি গুরুতর উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। মণিভাকে বারবার করে বল্‌তে হচ্ছে, সে সাবধানে থাকবে। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় যাবে না। জগদীশবাবু বল্‌ছেন, কখনো তুমি ওসব করোনি, আমরা করতে দিইওনি ; একথার লক্ষ্যস্থল অবশ্য ইন্দ্রজিৎ। এই স্নেহের অত্যাচার অসহ্য, উভয়েরই অসহ্য লাগে, অথচ এই অসহায় অবস্থার সুযোগ ওঁরা নেবেনই। প্রতি শনিবারে ওঁদের আগমন তাই আর আনন্দ না জাগিয়ে এঁদের প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার করেছে। প্রতি-বারেই তাঁরা বল্‌বেন একই কথা, বারবার একই সতর্কবাণী। অথচ মণিভা ভাবে কেন ওঁরা বোঝেন না, নিজের সংসারে খাটতে কত আনন্দ, কতখানি তৃপ্তি।

তারপর অনেক অনুযোগ, অনেক উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের পর গাড়ীখানি অবশেষে মিলিয়ে যায়। কী তীব্র অবনমন! উগ্র-উৎসাহ আর সজীবতার উষ্ণতা, স্নেহের এই তুষারস্পর্শে অনেকখানি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বাড়ীতে ফিরে সহসা সব শূন্য মনে হয়। প্রচুর থালা গেলাসে রান্নাঘর পরিপূর্ণ, বস্‌বার ঘরে শূন্য চায়ের পেয়ালা, বিশৃঙ্খলতায় সারা বাড়ীখানি আজ কুৎসিত দেখাচ্ছে।

জিনিষপত্র সাজিয়ে গোছ করে বাড়ীর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়ে আন্‌তে বেশ রাত হয়ে গেল। পূর্ব্বের স্বাচ্ছন্দ্য আর শ্রী ফিরে এলো আরো অনেক পরে, বাড়ীর সজীবতা যেন নতুন করে ফিরে আসে। রামশরণ ভাঁড়ার ঘর থেকে তরিতরকারীর ঝুড়ি এনে রান্নাঘরে সাজিয়েছে, বাইরের ঘরের বেতের চেয়ার আবার স্বস্থানে সাজানো হোল, এক কথায় পট পরিবর্ত্তন।

—আর একটা দিন নষ্ট হোল, মণিভা বলে ইন্দ্রজিতকে। এতক্ষণে মুখরিত হোল ইন্দ্রজিত,—এদিন আর ফির্‌বে না মণি, সম্পূর্ণ শনিবার, সম্পূর্ণ রবিবার আরো কত এমনই নষ্ট হ'বে হয়ত।

এই ঘটনা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ঘট্‌ছে, গত দু'মাস ধরে নিয়মিত-ভাবেই চলেছে এই সাপ্তাহান্তিক অভিযান! ইন্দ্রজিতের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল, খানিক চুপ করে আবার বলে, এইভাবে চলে যাবে বসন্তের, দিন, তার সঙ্গে মৃত্যু হবে শিল্পী ইন্দ্রজিতের।

ইন্দ্রজিতের শেষের কথাগুলির রূঢ় রুক্ষ প্রকাশ মণিভাকে ব্যথিত করলেও সে-ও মনে মনে তা' স্বীকার করে, ঠিক এই কথাই সেও

ভাবছিল তবু সে আহত হোল। অভিমান-রুদ্ধকণ্ঠে বল্লে আমাদের ভালোর জন্যেই ত' ওঁরা আসেন।

—ধনী আত্মীয়ের এই আশ্রিতবাৎসল্য যে অপর পক্ষের পীড়ার কারণ হয়ে পড়ে, তা' বোঝান শক্ত, ক্ষতির পরিমাপ কে করে বলো?

ইন্দ্রজিতের এই উক্তির পর সেদিন আর দু'জনের মধ্যে কোন কথা হোল না। অমারাত্রির গাম্ভীর্য্য নিয়ে একই শয্যায় শুয়ে উভয়ের বিনিদ্র রজনী কাটলো, দারুণ দুঃস্বপ্নের মতো।

কিন্তু এ মেঘ কাটলো পরদিন প্রভাতে, ফিরে এলো পূর্ব্বতন প্রশান্তি, আবার উঠলো ঐন্দ্রজালিক যবনিকা। আশ্চর্য্য! মণিভা ভেবে অবাক হয়ে যায় যাদের কাছে জীবনের প্রথম উন্মেষ থেকে এই দীর্ঘ বাইশ বছর কেটেছে, আজ তারা কোথায় সরে গেছে। তারা আজ কেউ নয়, তাদের উপস্থিতির চেয়ে ইন্দ্রজিতের প্রশান্ত মুখই আজ পরম রমণীয়। ইন্দ্রজিৎ তার একান্ত আপন, তার সম্পূর্ণ সত্তা মিশে গেছে ইন্দ্রজিতের জীবনে। মণিভার দেহ মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে ইন্দ্রজিতের স্পর্শে, যেন সুরে বাঁধা সুরবাহার, বাগানে যখন তারা শিশুর মতো লুকোচুরি খেলে বেড়ায়, যখন বাতাসে মণিভার অঞ্চলপ্রান্ত লঘুপক্ষ চঞ্চল বলাকার মতো উড়ে বেড়ায়, তখন যদি মা তাঁকে দেখতেন, যে-আনন্দ, যে-অনুভূতি, যে-উত্তেজনা মণিভার সারা দেহে মনে ও জীবনে আজ পরিপ্লাবিত মা কি সারা জীবনেও তার কণামাত্র উপভোগ করেছেন, কে জানে!

এদিকের কাজ সেরে মণিভা চলে এলো রান্নাঘরে। রান্নাঘর,

বসবার ঘর, শোবার ঘর, সব কি আমার—মণিভার মনে হোল। এই বাড়ীর প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি ধূলিকণাটুকুতে তার স্পর্শ, চতুর্দ্দিকে তার কল-গীতির উষ্ণ আমেজ, হয়ত একদিন যখন সে আর থাকবে না তখন এই সুরগুঞ্জন অনুরণিত হবে ইন্দ্রজিতের অবচেতন মনে, কিন্তু না—সে কথা ভাবা যায়না, মণিভাকে যদি একান্তই যেতে হয় এই সব ছেড়ে, তা'হলে তার সূক্ষ্ম আত্মা চিরকাল এইখানেই বিরাজমান থাকবে, এই মর্ত্ত্যের স্বর্গে।

বিকালে বাগানে ফুল তুল্‌তে গিয়ে বড় ভালো লাগ্‌লো সাঁজের ম্লান সূর্য্য কিরণ, তাড়াতাড়ি সে ইন্দ্রজিতকে বাগানে ডেকে আন্‌লে, বললে আজ এখানেই চা খাওয়া যাক্। মণিভা ইন্দ্রজিতের বাহুবন্ধনে ধরা দিল। এত সুখ যে তার জীবনে লুকিয়েছিল, কে জান্‌তো!

গড়িয়ে গেল বুধবার, বৃহস্পতিবার মসৃণভাবে, নিজস্ব ধারায়। শুক্রবার সকালে টেলিফোনের বেল বেজে উঠ্‌ল—

—থিয়েটার রোড থেকে—মণিভা বল্লে ইন্দ্রজিতকে—ওঁরা কাল আস্‌বেন।

—তারপর শনি এবং রবিবার, ইন্দ্রজিৎ নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বল্‌লে।

—নতুনের মধ্যে এবারে পিসিমাও আস্‌ছেন, আমাদের গৃহস্থালী দেখতে। মণিভা শেষের কথাগুলি ভয়ে ভয়ে উচ্চারিত কর্‌ল।

এ শুভ সংবাদ আমাকে যদি নাই দিতে মণি!

মণিভা চুপ করে রইলো!

শনিবার সকাল থেকেই বাড়ীর আবহাওয়া ক্রমশঃই ভারী হয়ে

উঠতে লাগ্‌ল। এ ক'দিনের মধুর সৌন্দর্য্য, মধুর অনুভূতি অবলুপ্ত হোল, উজ্জ্বল লাগে না আর সূর্য্য কিরণ, বাতাসে নেই সে আকর্ষণ। সারাদিনটা ভয়ে ভয়ে অজানা আশঙ্কায় কাট্‌লো, আহারেও যেন রুচির অভাব ঘটেছে, জীবনটা অকস্মাৎ বিস্বাদ হয়ে গেছে। শুক্রবার সকালে ফোণের সাম্‌নে যেমন বসেছিল, মণিভা আর ইন্দ্রজিত আজও তেমনি আছে, শুধু নেই সেই প্রাণ চঞ্চলতা।

যথারীতি সন্ধ্যার আগেই গেটের সাম্‌নে গাড়ী থাম্‌লো। প্রথমে নামলো চিরপরিচিত সুট্‌কেশ আর খুঁটিনাটির বোঝা, তারপর এলো জগদীশ বাবুর সস্নেহ কণ্ঠস্বর, কিগো মা মণি, শরীর কেমন? বাবা ও মা ভারী দেহ নিয়ে কোনোমতে বাগানে এসে দাঁড়ালেন, পচার মা ধরে ধরে নিয়ে আস্‌ছে অথর্ব্ব পিসিমাকে। একটু সাবধানে এসো দিদি, এখানটায় আবার একটা গর্ত্ত আছে, সতর্ক করে দিলেন জগদীশ বাবু।

বাবা, মা ও পিসিমার আগমনে সারা বাড়ীটি যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল, পিসিমা এতখানি এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, মা তাড়াতাড়ি তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে, বাড়ীর বিশৃঙ্খলতা পরিদর্শন করে বেড়া তে লাগলেন।

ওদিকে প্রশস্ত ইজি চেয়ারে শুয়ে (নিজে ব্যবহার করবেন বলে তিনিই পাঠিয়েছিলেন) জগদীশবাবু ইন্দ্রজিৎকে বল্লেন—কি হে তোমার ছবি টবি কি রকম হচ্ছে, একজিবিসন কি মাসে বলেছিলে? আমাদের যদি এত সময় থাক্‌তো আর যদি ছবি আঁকাই কাজ হোত এতদিনে হয়ত কত ছবি এঁকে ফেল্‌তুম, কি বলো!

ইন্দ্রজিৎ ছেলেটি এদিকে বেশ নিরীহ, কিন্তু একালে নিরীহ ছেলে

কি করবে সংসারে, এই জন্যেই এ বিবাহে তাঁর উৎসাহ ছিল না, তবে একমাত্র মেয়ে মণিভার আগ্রহের কাছে তাঁর পরাজয় ঘটলো, মেয়েদের মন বোঝা কঠিন, এতদিনেও মণির মাকে বোঝা গেল না। থাক এ-ক'টা দিন, বোশেখ মাসে বসিয়ে দিতে হবে ইন্দ্রজিতকে লোহার কারবারে, শিখুক কাজ চালাতে, ওকেই ত' পরে সব করতে হ'বে।

ইন্দ্রজিতের যা-সম্পদ তাতে হয়ত একরকম মোটামুটি চলে যাবে, কিন্তু তাই কি সব? লোহার কারবারে যার হাজার হাজার টাকা খাট্‌ছে তাঁরই একমাত্র মেয়ে জামাই সমাজবিচ্যুত দুঃখীর মতো জীবন কাটাবে কেন! মণিভার অনুরোধে অনুমতি দিয়ে কাজটা হয়ত ভালো হয়নি, মণিভার ছিল সুপ্রচুর সুবিধা, গাড়ী, সমাজ, পার্টি, অলঙ্কার শাড়ী আর কি চাই। তা সত্ত্বেও সে যদি স্বেচ্ছায় এই ইন্দ্রজিতকে বরণ করে থাকে তার জন্য দায়ী মণিভার নির্ব্বুদ্ধিতা। কি না শিল্পী, আর্টিষ্ট, ভারী কাজ, এন্তার রঙ গুলে ক্যান্‌ভাসে মাখিয়ে দিন কাটাও, রঙওলা মিস্ত্রীরাও ত' এই কাজই করে, এতে আসবে যশ, এতে আসবে ঐশ্বর্য্য। এত কষ্টেও কিন্তু মণিভার মুখে শান্তি আছে কি করে, তাই জগদীশ বাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন।

সিগারের ধোঁয়ার সঙ্গে জগদীশবাবুর চিন্তাজাল ভেসে বেড়ায়, ইন্দ্রজিতকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার উত্তর মিলেছে কিনা তা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। মণিভার মুখখানি সুন্দর দেখাচ্ছে, একদিন মণির মাও ঐ রকম ছিলেন, জগদীশ বাবু বল্লেন—আর ক'টা দিন মণি, দোশরা বোশেখ তোদের সব নিয়ে যাব। কি হবে ছবিতে?

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মণিভার মা বল্লেন—সেই ভালো বড় কষ্ট তোর—

মণিভা আর কি বলতে পারে—চলে গেল তার বসন্ত দিন, শেষ হোল প্রথম প্রেমের স্বপ্ন।

মণিভা ও ইন্দ্রজিৎ ম্লান মুখে নীরবে বসে রইল—

এবার সহরে সূর্য্যোদয়।

শৃঙ্খল

সহরের শ্রেণীবদ্ধ বাড়িগুলি একে একে ট্রেণের জানালা দিয়ে অদৃশ্য হোল, এইবার ব্রীজের ওপর ট্রেণ উঠলো, বিস্তীর্ণ জলরাশি! সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত এই সুনীল জলোচ্ছ্বাসে পরিতোষের অন্তর আনন্দে নৃত্য করে উঠলো, আকাশ ও ধরণীর মিলনের সুনিবিড় ছন্দে নিরুদ্দেশ যাত্রার কলধ্বনিতে নদীবক্ষ মুখর। পরিতোষের মনে হোল অন্তরের আশা ও ভালবাসার শেষ বিন্দুটুকু দিয়ে এই যেন সে এতকাল মনে মনে কামনা করেছে, অবগাহনে কি প্রশান্তি!—কিন্তু কতক্ষণ! প্রখর গতিবেগে ট্রেণ ছুটে চলেছে, নদীর আহ্বানে সাড়া দেবার অবসর তার কই, নদী পার হয়ে ততক্ষণ সুদূর প্রসারিত জনহীন প্রান্তরের মধ্যে ক্লান্তিহীন বেগে ট্রেণ তেমনই ছুটে চললো। যে ক্ষণিক আনন্দে পরিতোষের অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, গভীর নৈরাশ্য ও অবসাদের বেদনায় তা আবার ভেঙে পড়ল।

অতসী তার সেই ভয়াবহ প্যাকেটটি নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে, স্ত্রীর গতানুগতিক কার্য্যক্রম পরিতোষ মনে মনে কল্পনা করতে লাগল, তূলাভরা বাক্স থেকে ছোট্ট হাইপোডারমিকটি তুলে নিয়ে সতর্ক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে তা পূর্ণ করা হয়েছে, তারপর অতসীর শুভ্র বাহুমূলের এক নিঃসংক্রামক অংশে ইন্‌সুলিন ফুটিয়ে দেওয়া হোল। দিনে তিনবার এই তার কাজ...

অতসী এখন দৃষ্টির অগোচরে তাই পরিতোষ অতসীর কথাই চিন্তা করতে লাগল। আতসী হয়ত খুব খুসী হয়েছে, দীর্ঘ দুটি মাস বাপের বাড়ি অতিবাহিত করতে কোন্ মেয়ে না ভালবাসে, বিশেষ করে যে দেশে সারা ছোটবেলা কেটেছে সে দেশের ওপর অতসীর এখনও গভীর মমতা বর্ত্তমান।

নদীর ধারেই অতসীদের বাড়ি, অথচ পরিতোষের এত প্রিয় হলেও তার পক্ষে নদীর আনন্দ উপভোগ করা আর সহজ হবে না। অতসীকে না নিয়েও নৌকাবিহার করা সম্ভব, কিন্তু নিজের স্ত্রীর সাহচর্য্যই পরিতোষের কাম্য। এই অতসী একদিন কি ছিল, শূন্যদৃষ্টিতে চলমান প্রান্তরের দিকে চেয়ে পরিতোষের চোখ দুটি বাষ্পাকুল হয়ে উঠলো। পাঁচ বছর আগে পরিতোষের মোটর বোট 'জলতরঙ্গে' অতসীকে দেখে কতলোক ঈর্ষান্বিত হয়েছে। তার প্রত্যক্ষ প্রখর ভঙ্গী, দুর্ব্বার চাঞ্চল্যে বিচ্ছুরিত। যৌবনের প্রথম শিহরায়মানতায় পরিতোষ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেত, তার যা কিছু প্রয়োজন সেদিন এই অতসীতেই পরিতৃপ্ত হয়েছিল। তাই অতসীকে বিবাহ করবার পর প্রচ্ছন্ন প্রসন্নতায় পরিতোষ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল, সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের সার্থক পরিকল্পনায় পরিতোষ বিভোর হয়েছিল। তারপর অতসীর অসুখ হোল, অলক্ষ্য মৃত্যুর ক্রমসন্নিহিততায় সে এগিয়ে চলেছে, এ অসুখ আর সারবে না, আর যতকাল এই ইন্‌সুলিন চলবে, ততকাল অবশ্য মৃত্যুর কোনো আশঙ্কা নাই।

অতসীর মার কথা পরিতোষের মনে হোল, তিনিও চিরদিনই অসুস্থ, রোগজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরটি শয্যাশায়িনী হয়ে কোনমতে বহন করে চলেছেন। এই রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্য্যা করেই, অতসীর বাবা চন্দ্রনাথ

বাবুর সারা জীবনটা শঙ্কা ও সংশয়ের মধ্যে কেটে গেল। শয়নাশয়রে সেবাব্রতী স্বামীর সান্নিধ্যে সাধ্বী সতী কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করছেন। তবু তাঁর রোগ অতসীর মত এত কঠিন নয়, তবে এভাবেই এখনও তাঁর অনেকদিন কাটবে।

বিলু মজুমদারের কথা সহসা পরিতোষের মনে হোল। সুশীল সোমের মেয়ে সুলতার সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক, হঠাৎ শোনা গেলে বিয়ে ভেঙে গেল, কৌতূহলী বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে বিলু বলেছিল—খুব বেঁচে গিয়েছি বাবা, সুলতার মাকে দেখেই মনে হোল 'যঃ পলায়তি সঃ জীবতি—! সেখানে স্বাস্থ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের প্রশ্নটাও জড়িত ছিল। অতসী কিন্তু সুন্দরী, বর্ণ অত্যন্ত গৌর, দীর্ঘছন্দ দেহ সুষমা ও মর্য্যাদায় পরিপূর্ণ। অতসীর মাও তাই, দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর বর্ণ এতটুকু ম্লান হয়নি। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে ভালোর সঙ্গে মন্দটাও সন্তানের ওপর কম প্রতিফলিত হয় না, তাই বোধ করি অতসী মার মত এমনই রোগজীর্ণ হয়ে পড়লো।

স্ত্রী-সেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, ভালোমানুষ শ্বশুরটির কথা পরিতোষের মনে হোল, জীবনের অত্যুজ্জ্বল উন্মত্ততার অবসান ঘটেছে, আনন্দসৌম মুখখানিতে একটা কঠিন বেদনাভূতির ছাপ। একদা চোখে যখন মাদকতা ছিল, মন ছিল সবুজ, সেদিন এই সহচরীকে অবলম্বন করেই পরিপূর্ণ উর্ব্বর জীবনের সুদূরপ্রসারী কল্পনায় মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, তারপর সময়ের পরিপ্রবাহে, নিগূঢ় অন্ধকারে পথ আর চেনা যায় না, আত্ম-দৈত্যের দুর্লঙ্ঘ্য ইঙ্গিতে এক অদৃশ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হয়ে মানুষ আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

ট্রেণের জানালার বাইরে তাকিয়ে পরিতোষ আত্মগতভাবে বলে উঠল,—

"—জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই
ছাড়াতে গেল ব্যথা বাজে"

এতক্ষণে বাথরুমের দরজা ঠেলে অতসী বেরিয়ে এল, মুখে তার শিথিল তন্দ্রাতুর হাসি, দেহে স্নিগ্ধ মধুরিমা। একদা সে সুন্দরী ছিল বটে, রোগজীর্ণ দেহের লাবণ্য ম্লান হলেও সারা শরীরে একটা অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্য বর্ত্তমান, আজো সে নিঃশেষিত হয়নি। পরিতোষের পাশে বসে বিসর্পিত লীলায় তার বাহু স্পর্শ করলো অতসী, মৃদু হেসে পরিতোষ এ অভিনন্দনের উত্তর দেবার চেষ্টা করলো বটে, কিন্তু মানসদ্বন্দ্বের সংঘাতে ব্যথাহত পরিতোষ আবার জানলার বাইরে চোখ ফেরালো। একদা এই স্ত্রী নিয়ে পরিতোষ অবলীলাক্রমে বিশ্বজয়ের কল্পনা করেছিল। অতসীর মুখের দিকে তাকালো পরিতোষ, টাইম্ টেবলের পাতায় অতসীর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, কঠিন অথচ শান্ত সমাহিত তার মুখভঙ্গী। পরিতোষ অকারণে ক্রুদ্ধ ও ব্যথিত হয়ে উঠল।

অপরিজ্ঞাত জীবনযাত্রায় উভয়ে জড়িত, অতসীর জন্য পরিতোষের বেদনার আর সীমা নেই, অতসী তার ঘূর্ণ্যমান গতির অচপল মেরুদণ্ড, একদিন যে অতসী প্রচুর ও প্রগল্‌ভ ছিল আজ সে রাশীভূত নির্জ্জীবতায় পরিণত, কিন্তু মেয়েদের সংযম ও সহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়, ডাক্তার স্পষ্টতঃ রোগ ঘোষণা করার পর থেকেই অতসীর মধ্যে এই নির্ভীক সহিষ্ণুতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

পুরুষের চেয়ে নারীর সহ্যশক্তি বেশী, এতও পারে ওরা......
যদি কোনো পুরুষকে বলা হয় সারা জীবন ধরে শুধু প্রাণধারণ করা ছাড়া আর কিছু আশা কোরো না, তাহ'লে সে তা সহ্য করতে পারবে না—পরিতোষ তৎক্ষণাৎ সেই জীবন অবসানে সচেষ্ট হয়ে উঠতো, এক বিন্দু বাঁচার আশা রাখতো না। কিন্তু স্ত্রী-চরিত্র বিভিন্ন, এমন কি স্বয়ং দেবতারও অজ্ঞাত!

পরিতোষের মনে হোল অসুখ হলেও মেয়েদের কিছু এসে যায় না। অসহিষ্ণু পরিতোষ সরে বসল। ট্রেণ ষ্টেশনের কাছে এসে পড়েছে, চাকায় চাকায় একটা ভাষাহীন, অর্থহীন শব্দতরঙ্গ ক্রমান্বয়ে একই সুরে অনুরণিত হচ্ছে—জড়ায়ে আছে বাধা—জড়ায়ে আছে বাধা—জড়ায়ে—

কি বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি!

পরিতোষ সভয়ে উঠে দাঁড়ালো।

পরিতোষে শ্বশুর চন্দ্রনাথ চৌধুরীর বাগানটি মনোরম, পশ্চিমে নদী, পূবে প্রকাণ্ড মাঠ, হাওয়া আর আলো প্রচুর। কলেজের অধ্যপনা আর রোগিণীর পরিচর্য্যার অবসরকালে সমস্ত উৎসাহ ব্যয় করে চন্দ্রনাথ বাবু উদ্যান রচনা করেছেন। পরিতোষ বিশ্রান্তভঙ্গীতে মার্শাল নীলের কুঞ্জতলে এসে বসল।

সূর্য্যাস্তরাগের মত উজ্জ্বল ভঙ্গীতে, প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত অতসী বাগানের চারিদিকে চঞ্চলতায় বিচ্ছুরিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগানের কেন্দ্রস্থলে চন্দ্রনাথবাবু সম্প্রতি একটি সূর্য্যঘড়ি স্থাপিত

করেছেন, তার ব্রোঞ্জ প্লেটটিতে অতসীর সর্পিল আঙ্গুলগুলি খেলা করছে, বাগানের এখানে-ওখানে অজস্র ফুলগাছ লাগানো হয়েছে, অকালপ্রস্ফুটিত অজস্র দুষ্পাপ্য ফুল ফুটে রয়েছে, অতসী নূতন চোখে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগল, তারপর সহসা পিছন থেকে পরিতোষের কাঁধের ওপর পড়ে বলল—নতুন প্ল্যানে বাগানটা চমৎকার মানিয়েছে না?

অতসীর কথাগুলি শেষের দিকে ঈষৎ কেঁপে উঠল,—খুসী হলে তার গলার স্বর এমনই কাঁপে, এই কণ্ঠস্বরে এমন একটা আকুল অনুনয়ের আবেদন ধ্বনিত হোল যা পরিতোষ সহজেই বুঝলো। অতসী চায় এই বাগান, এই বাড়ি, এই নূতন আবহাওয়া তার ভালো লাগুক, অতসীর ক্রটির জন্যই যে পরিতোষ এই নৈরাশ্যময় অস্বাচ্ছন্দের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তার জন্যে সে আকুলকণ্ঠে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছে।

শান্তকণ্ঠে পরিতোষ বললে,—চুপ করে একটু বসো দেখি, এসে অবধি ঘোরাফেরা স্থরু করেছ, তারপর পরিশ্রান্ত হয়ে শেষকালে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলবে—

আজ এই ব্যঞ্জনাব্যাকুল ভঙ্গী পরিতোষের কাছে বিরক্তিকর। সব কিছুর সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য করে নিতে হয়েছে, এখন আর উচ্ছৃঙ্খলতার উল্লাসে আত্মহারা হবার সামর্থ্য নেই, আকাশব্যাপী বিশাল শূন্যতায় জীবন ভরে আছে, এখন তাই চুপচাপ এই বাগানে বসে থাকাই চলে, অতীতের সেই উজ্জ্বল উন্মত্ততা তাদের উপেক্ষা করেছে।

পুরাতন পরিবেশে ফিরে অতসী খুসী হয়েছে পরিতোষ তা বোঝে, কিন্তু এ গৃহসুখ পরিতোষের এখনও সইছে না। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে

তাই তার অপরিসীম বিরক্তি, ক্ষণস্ফুরণের অসহ্য দীপ্তিতেই তার জীবনানন্দ, এই বিরতিময় বিস্মৃতি তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে। অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাসে পরিতোষ মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠে।

চন্দ্রনাথবাবুর ওপর অতসীর অসীম ভক্তি, কিন্তু মার সম্বন্ধে সে চিরদিনই একটু অসহিষ্ণু, এই স্ত্রীর জন্যই ত তাঁকে কতখানি বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে, এই কথা বলে অতসী বহুবার আক্ষেপ করেছে।

আবার পরিতোষের জীবনে তারই প্রখর পুনরাবৃত্তি। পারস্পরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতসী ও পরিতোষ এক অলক্ষ্য মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়ছে। পরিতোষের এই বিমনা ভঙ্গী দেখে অতসী সংশয়-উদ্বেলকণ্ঠে প্রশ্ন করল —'কি হয়েছে তোমার, অসুখ-টসুখ করেনি ত?'

পরিতোষ ম্লান হেসে বলল,—'না, হয়নি কিছু, চলো ভেতরে যাই, আবার হিম লেগে তোমার অসুখ না বেড়ে যায়।'

চন্দ্রনাথবাবু একমনে কাগজ পড়ছিলেন, সহসা পরিতোষের দিকে ফিরে বল্লেন—অতসীর শরীরটাও যে ওর মার মত হয়ে উঠবে, তা কোন-দিন ভাবিনি, মেয়েদের আবার ডায়বিটিশ হতে পারে, আশ্চর্য্য! এখন লিভারে গ্লিকোজেন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, মেটাবলিজম ঠিক রাখতে হবে, ডায়েট রেষ্ট্রিকস্‌ন—ওই ইনসুলিনই এখন চলবে ত?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরিতোষ বল্লে—দিনে তিনবার, তবে আর কোনও ভয় নেই!

চন্দ্রনাথবাবু চশমাটা খুলে কাপড় দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্লেন—ওর অসুখ হয়ে অবধি মনটা আমার বড়ই চঞ্চল হয়ে আছে, তাই ত তোমাদের এখানে টেনে আনলুম, এই বয়সেই এমন অসুখে জড়িয়ে পড়ল, সারা জীবনটা সামনে পড়ে—

পরিতোষ এ কথার আর কি উত্তর দেবে—অতিকষ্টে বল্লে, কি আর করা যাবে !

—অথচ এমনই আশ্চর্য্য কাণ্ড পরিতোষ, ছেলেবেলায়ও কি রকম স্কিপ্ করতো, দৌড়ত যেন হরিণের মতো, কতবার দৌড়ের প্রাইজ পেয়েছে। বরাবর আশা ছিল সংসারে অতসী বহুদূরের পাড়ি দেবে, কিছুই তাকে আটকাতে পারবে না, কিন্তু কি যে হোল—

স্নেহময় পিতার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে উঠল।

পরিতোষ অপরাধীর মতো শুষ্ককণ্ঠে বলল—নিয়তির হাত থেকে ত আর নিষ্কৃতি নেই—

—ঠিক বলেছ, নিয়তি, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'—লখীন্দরকে লোহার ঘরে রেখেছিল, ভগবানের কাছে বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছি, এই আমার একটি সন্তান প্রাণে বাঁচুক, তুমি তো জান, ওর ওপর আমার কতখানি দুর্ব্বলতা !

এরপর কথা আর অগ্রসর হয় না, অন্দর থেকে আহারের অহ্বান এলো !

শোবার সময় পরিতোষ লক্ষ্য করল, অতি পরিচিত সেই বিরাট পালঙ্কটি অদৃশ্য হয়েছে। আগে আগে সেই শয্যায় অনেক বিনিদ্র রজনী কেটেছে। তার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট দুটি বিভিন্ন খাটে পাশাপাশি শয্যা রচনা করা হয়েছে, অতসীর নিঃসঙ্গ শয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরিতোষ আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। পূবদিকের জানালা দিয়ে আলো আসছে, এ আলো তার চোখে ভালো লাগল না, সে চোখ বুজিয়ে

প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কখন নিঃশব্দে অতসী এসে শুয়েছে পরিতোষ টের পায়নি। সহসা পাশ ফিরতে গিয়ে অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে অতসীর বিশীর্ণ দেহখানি পরিতোষ লক্ষ্য করতে লাগল।

অতসী কিন্তু তখনও ঘুমোয় নি, পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে কি না জানবার জন্য প্রশ্ন করলো—ঘুমুলে নাকি !

—না—, আমি মনে করলাম তুমি বুঝি ঘুমিয়েছ।

—ঘুম আজ আর হবে না বোধ হয়—

পরিতোষ অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তার অন্তর আকুল, সে বলল—তেখনই তোমায় বারণ করলাম অত হুটোপাটি কোরো না, শরীর খারাপ হবে, কথা ত শুনবে না—'

—অথচ তুমি যখন বললে তখন এতটা ভাবিনি !

পরিতোষ এ কথার কোনো উত্তর দিলে না।

কিছুক্ষণ পরে অতসী আবার বলে উঠল—আগেকার বড় বিছানাটায় কেমন আমরা লুকোচুরী খেলতাম, মনে আছে তোমার ?

—সে কথা ভেবে লাভ কি বলো ? তুমি বরং একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

অতসীর আর সাড়া পাওয়া গেল না।

সকালে চন্দ্রনাথবাবু কলেজে বেরোবার সময় মিসেস চৌধুরী

অতিকষ্টে একবার নীচে নেমে এলেন। এই সময়টা স্বামীর আহারাদি তদারক করা তাঁর দীর্ঘাচরিত অভ্যাস।

বেরোবার সময় চন্দ্রনাথবাবু বল্লেন—তাহ'লে ডাঃ গাঙুলী আর যতীনবাবুদের কাল এখানে আসতে বলবো ত?

—ওঃ সেই পার্টির কথা, আমিও এই কথাই ভাবছিলুম, এখন কিন্তু কাউকে না ডাকাই ভালো, কাল সারারাত মেয়েটা ঘুমুতে পারে নি, চোখটা কি রকম ফুলে উঠেছে, শরীরটা মোটেই যুৎ নয়, তারপর ঐ যতীনবাবু এমন চেঁচিয়ে কথা বলেন, আমার ত' মাথা ধরে ওঠে, কিছুদিন পরে না হয় দেখা যাবে। এখন পরিতোষ-অতসীকে নিয়ে নিজেরাই ক'দিন আমোদ করে কাটিয়ে দেব।

চন্দ্রনাথবাবু টাই বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে বল্লেন—বেশ, তাই হবে, আমি মনে করেছিলুম অতসীর হয়ত ভালো লাগবে—

—অতসী, অত বড় মেয়ে শরীরের ওপর একটুও যত্ন নেই, আশ্চর্য্য মেয়ে! এতদিনেও কিছু শিখলে না, আমাকেই তাই দেখতে হবে—

পরিতোষ একপাশে দাঁড়িয়েছিল, এই ব্যাধিজর্জ্জর ক্লান্তিকর পরিবেশ তার কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক, সারারাত বিনিদ্র নয়নে এই কথাই তার মনে হয়েছে, চন্দ্রনাথবাবুর দিকে চেয়ে মনে হোল এ যেন তারই পনের বছর পরের প্রতিরূপ।...পনের বছর পর?

এমন সময় অতসী নেমে এলো, এর মধ্যে তার স্নান শেষ হয়েছে, সিক্ত চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কপালে একটি ছোট্ট সিঁদুর-

টিপ পরেছে, এখন তাকে তবু কতকটা সজীব দেখাচ্ছে, সেই পুরাতন রূপের ভগ্নাংশ তার শরীরে প্রতিফলিত। এই মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখের দিকে চেয়ে পরিতোষের আবার মনে হোল সে এক অলক্ষ্য শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, মুক্তির কোনও পথ নেই।

চন্দ্রনাথবাবু অতসীকে আদর করে বল্লেন—আজ আবার এত সকালেই চান হয়ে গেল, শরীরটার একটু যত্ন নাও মা!

অতসী হেসে বল্লে—আমি ত' ভালোই আছি এখন একবার যতীনবাবুর বাড়ি যাবো বাবা, এখনই ফিরে আসবো, যতীনবাবুর স্ত্রী কাল এসেছিলেন শুনলুম।

মিসেস চৌধুরী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—না না, কালকে ঘোরাঘুরি করে তোমার শরীরটা আজ ভালো নেই, আজ আবার অতদূর, সে কি হয়! নিজের শরীর যদি তুমি না দেখো, আমাকেই তার ভার নিতে হবে।

অতসী মা'র গলা জড়িয়া বল্লে—সারাদিন কি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকবো মা, পাগল হয়ে যাবো শেষকালে।

মিসেস চৌধুরী অসহায় ভঙ্গীতে পরিতোষের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—তুমি একটু বুঝিয়ে বলো বাবা, কি বেয়াড়া সাহস দেখ দেখি—

অতসী অভিমানভরে বল্লে—তাহলে কি করবো বল মা?

এই সমস্যার মীমাংসা করে চন্দ্রনাথবাবু বল্লেন—আমার কারে ওরা দুজনেই চলুক না, আবার কারেই ফিরবে'খন, পরিতোষ সঙ্গে থাকলে দেরী হবে না হয়ত।

পরিতোষকে যেতে হোল, মিসেস চৌধুরীর এই অতি সাবধানতায়

তার বিরক্তির আর সীমা রইল না, সকলকেই তাঁর সাবধানী জালে আটকিয়ে মুসকিল আসান করতে চান। ভালো বিপদ।

ফেরার পথে কারে উঠেই পরিতোষের হাত দুটি ধরে অতসী আবেদনের ভঙ্গীতে বললে—তোমার এখানে একটুও ভালো লাগছে না—না?

—না, মন্দ কি!

—দিনরাত তোমার কেমন একটা আনমনা ভাব আমি কদিন ধরেই লক্ষ্য করছি, তোমার বিলু মজুমদারকে না হয় এখানে আসতে লিখে দাও না, সে ত' বারো মাস ট্যুর করেই বেড়ায়, কিংবা নিজেও কোথায় বেড়িয়ে আসতে পারো, এ রকম কষ্ট করে দিন কাটানোর কোনও মানে হয় না।

—বিলুকে এনে আর কি হবে? তা ছাড়া, আমার কষ্ট হচ্ছে, একথাই বা তোমাকে বল্লে কে? আমি তোমার স্বামী, তোমার কাছেই আমাকে চিরদিন থাকতে হবে।

—অর্থাৎ আরো দুঃখভোগ করবে এই ত', কিন্তু তুমি কি জানোনা তোমার মুখে হাসি দেখলেই আমি খুসী হই।

—তাতে কোন লাভ নেই অতসী, অন্য কোথাও গিয়ে কি শান্তি পাব, এখানেই থাকবো, তোমার কাছেই থাকতে চাই।

—তার মানে সারা জীবনটা এইভাবেই কাটিয়ে দেবে, দুঃখ ও দুর্দ্দশার ভেতর দিন কাটানো তোমার পক্ষে যে কত কঠিন তা কি আমি জানি না, তাই বুঝি তোমার মনে শান্তি নেই?

—কে বল্লে তোমায় শান্তি নেই, আমি বেশ আছি।

—আমার কাছে লুকিয়ো না, যা তোমার মনে হয় আমাকে খুলে বলো, আমার একটুও কষ্ট হবে না, আমিই তোমার জীবনটা মাটি করে দিলুম।

—কি পাগলের মত বক্‌ছ? জীবন কি এত সহজেই নষ্ট হয় অতসী!

—আমার কাছে তুমি লুকোও, কষ্ট তোমার আছে, কি তুমি এত ভাবো দিনরাত, তোমার মনের কথা যদি গোপন রাখো, তাহ'লে আমার ওপর যে কত বড় অবিচার করা হবে তা তুমি বুঝবে না। আমি তোমাকে সুখী কর্‌তে চাই, অনেকদিন ধরেই বল্‌বো মনে করেছি কিন্তু ভরসা হয়নি।

—যা তোমার বক্তব্য নির্ভয়ে বলো।

—তুমি আবার একটি বিয়ে করো, সুখী হও!

—ছিঃ ছি, এ কি কথা, একালের মেয়ে হয়ে তুমি একথা কি করে উচ্চারণ কর্‌লে, তুমি রয়েছ, আবার বিয়ে! তোমাকে যে আমি ভালোবাসি তা কি জানো না?

—একাল সেকাল বুঝি না, আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে।

—পাগ্‌লামি কোরোনা অতসী, বিয়ে দশজনকে করা যায় না, স্ত্রীলোকের পক্ষে যা নিয়ম পুরুষেরও তাই, আজ একজনকে শয্যা-সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী বলে আদর কর্‌ছি, কাল অপরে সেই শয্যার অংশ-ভাগিনী হয়ে বাহুবন্ধনে ধরা দেবে, তা কি হয় অতসী! তাকে বোধ করি বিয়ে বলে না—দোহাই তোমার, আমার রুচির ওপর একটু শ্রদ্ধা রেখো।

এর পর আর কথা চলে না, ব্যথা ও বেদনায় পরিতোষের অন্তর আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এখন আর কিছু ভাবা যায় না। অলক্ষ্য শৃঙ্খলের নির্ম্মম বন্ধনে উভয়ে জড়িয়ে আছে।

ট্রেণের চাকার সেই স্বর পুনরায় তার কানে অনুরণিত হোল—

জড়ায়ে আছে বাধা—জড়ায়ে আছে বাধা—জড়ায়ে—

কথার গতি ফেরাবার উদ্দেশ্যে পরিতোষ বল্লে—মাকে কেমন দেখ্ছো, শরীর কি একটুও সারেনি।

ওঁর কথা বোলো না, দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করে মার ধারণা হয়েছে এখনও উনি ভীষণ অসুস্থ, অসুখ মনে করেই মার স্বস্তি।

—বলো কি! ভাব্লেও ভীত হয়ে পড়ি!

—ভীত হবারই ত' কথা, আমি আর ভাবিনা।

—তোমার বাবা কিন্তু বেশ মানিয়ে নিয়েছেন, এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে এই অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চল্তে হোলে অনেকখানি সামর্থ্যের প্রয়োজন!

—বাবার জন্যই ত' আমার কষ্ট, এমন চমৎকার মানুষ, অথচ কি ভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

—একদিন ওঁরও মনে আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, অনেক কিছু পরিকল্পনা ছিল, অথচ জীবনেব গতিভঙ্গী অন্য পথে মোড় ফির্ল।

—জানি! অতসীর গলার স্বর কান্নায় করুণ হয়ে উঠল।

পরিতোষ চেয়ে দেখ্লো তার সুন্দর চোখ দুটি শিশিরসিক্ত

পদ্মপত্রের মতো অশ্রুভারে আচ্ছন্ন। পরিতোষ সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বল্লে—ছি কাঁদতে নেই, এতে আর কাঁদবার কি আছে বলো!

—বাবার কথা ভাব্ছি।

—বৃথাই মন খারাপ কর্ছো, দীর্ঘ কুড়ি বছর তাঁর এই ভাবেই কাটলো, তাঁর জীবন অনেকদিন শেষ হয়েছে, যাকে দেখ্ছ তিনি তাঁর প্রেতাত্মা।

সংযত হবার চেষ্টা করে অতসী পরিতোষের হাত দুটি চেপে ধরে বল্লে—এমনই অদৃষ্ট, আমার জীবনেও আবার তাই ঘট্লো।

—ও তোমার মনের ভুল, শীগ্গীরই তুমি সেরে উঠবে।

—সেরে আর উঠবো না, দিন দিন মার মত বিছানায় মিশিয়ে যাবো।

—আবার পাগলামী স্বরু কর্লে!

—যে অশান্তি তুমি ভোগ কর্ছো তা আমি জানি, এই অসুস্থ শরীর টেনে নিয়ে বেড়াতে আমারই কি ভালো লাগে, এ আমার প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অথচ পরিত্রাণ নেই।

—অসুখের আবার কেউ ভাণ করে নাকি। না রোগভোগ করা কারো সাধ।

অতসী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—জানো, যদি তোমার এমন অসুখ কর্তো, তা'হলে তোমার এক মুহূর্ত্তও বাঁচার বাসনা থাক্তো না, কি বিশ্রী অবস্থা, মাঝে মাঝে তাই ভাবি!

—সে আলাদা কথা, মেয়েদের প্রকৃতি ভিন্ন!

সচকিত হয়ে অতসী বলে—সে কি, কি বলছো তুমি ?

—তুমি কি জানো না, পুরুষের অসুখ আর মেয়েদের অসুখে প্রভেদ আছে, মেয়েদের পক্ষে অসুখটাই যেন স্বাভাবিক, ছিঃ আবার কাঁদতে সুরু কর্‌লে, চোখ মোছ, বাড়ির সামনে এসে পড়েছি।

অতসী চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে বলে—কান্নার কি আর শেষ আছে!

একটা বিপজ্জনক বাঁক নিয়ে গাড়ীটা গেটের ভেতর প্রবেশ কর্‌ল।

তিনদিন পরে পরিতোষের মনে হোল তারও যেন অসুখ করেছে, ঘটনাহীন, বৈচিত্র্যহীন গতানুগতিক দিন যাপনের গ্লানিতে অন্তর আচ্ছন্ন। চারিদিকে কেমন একটা বিষাদাচ্ছন্ন থম্‌থমে আবহাওয়া। বায়ুশূন্য টিনে যে ভাবে দ্রব্যাদি প্যাক করা হয়, পরিতোষকেও যেন তেমনি বাইরের প্রাণচঞ্চল আবহাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভ্যাকুয়াম-বদ্ধ করা হয়েছে।

এই মন্থর জীবনযাত্রায় সে যেন কিঞ্চিৎ আনন্দ বোধ কর্‌তে লাগ্‌ল, নিশ্চেষ্ট হয়ে চারিদিকে নিঃসঙ্গতার পরিমণ্ডল রচনা করে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেওয়াই যেন তার একমাত্র

এদিকে অতসীর মুখ যত ম্রিয়মান ও শীর্ণ হয়ে পড়ছে ততই যেন

সংবেদনশীল হওয়া, সে যদি বিবেচক হয়, পরিতোষও তাকে বুঝবে, পৃথিবীও হয়ত তাদের বুঝবে।

আলো নিভিয়ে পরিতোষ শুয়ে পড়ল, শাদা কাগজের মত পরিষ্কার মন, কোনো কিছু ভাবনা নেই, এখন ঘুম এলেই হয়। উন্মুক্ত জানালা দিয়ে মিঠে বাতাস ভেসে আসছে, হাওয়ায় মশারিটা দুলছে, ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে, পরিতোষ চুপ করে শুয়ে আছে। কি একটা পোকা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে, কি আওয়াজ তার! যেন বোম্বার প্লেন উড়ে চলেছে, বিছানায় শুয়ে আকাশের দুটি তারা দেখা যায়, আজ রাতে তারা দুটি বেশ উজ্জ্বল, পরিষ্কার দেখাচ্ছে, ক' হাজার মাইল, কত লক্ষ মাইল কে জানে? এক, দুই, কিংবা তিনের পিঠে যতগুলো পার শূন্য বসিয়ে নাও, কে আর গুণে পরীক্ষা করে দেখছে, অথচ খালি চোখে নাকি মোটে ৩২০০ তারা দেখা যায়। বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে এক ঝলক আলো ঘরে এসে পড়েছে, আলোটা চোখে বড় তীক্ষ্ণ হয়ে লাগছে, কী করছে অতসী এখনও, এ আলোর দিকে চেয়ে পরিতোষ নিজেই নিজেকে সম্মোহিত করতে পারে; ক্রমশঃ যেন আলোটা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে উঠছে, শাদা নয় হলদে, তারপর আবার সব মুছে গিয়ে সেই ছোট্ট শাদা বাল্‌ব, মজা মন্দ নয়, মাথার নীচে হাত দুটি একত্র রেখে চীৎ হয়ে শুয়ে এই তুচ্ছ অথচ চমকপ্রদ বস্তুগুলি পরিতোষ এক মনে লক্ষ্য করতে লাগল।

অতসী বেসিনে মুখ ধুয়ে আর্শীর সামনে দাঁড়ালো, কি ভেবে আবার হাত ধুয়ে এল, খোঁপাটা খুলে নতুন করে বাঁধবে, বোকার মত

পরিতোষ দেখতে লাগল, আজ সকাল থেকেই অতসী কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে আছে, বেশী কথা বলেনি সমস্ত দিন। দিন দিন কি স্তব্ধ জীবন হয়ে উঠছে উভয়ের, পরিতোষ ভাবতে লাগল, এই নতুন মনোভঙ্গীর জন্য সে একটা অস্বচ্ছন্দ আত্মপ্রসাদ অনুভব করলো। কিছুতেই আর কিছু এসে যায় না। সমুদ্রের কথা সহসা পরিতোষের মনে হোল, বাইরে এত উচ্ছ্বাস, এমন উত্তাল তরঙ্গ আলোড়ন অথচ অন্তরে একটা সুনিবিড় প্রশান্তি, কম্পন নেই, আকুলতা নেই, এক বিন্দু ভাবাবেগ নেই।

অতসী চুল বাঁধলো, কাপড়টা আবার নতুন করে ঘুরিয়ে পরলো, জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখলো, গতানুগতিক দৈনন্দিন কার্য্যক্রম, আর্শীতে অতসীর মুখের অর্দ্ধাংশ প্রতিফলিত, মাঝে মাঝে ভারী চমৎকার দেখায় অতসীকে। আলো নিভিয়ে অতসী শুতে এল।

মশারি তুলে বিছানায় উঠতে গিয়ে অন্ধকারে অতসী যথারীতি প্রশ্ন করল—ঘুমিয়েছ ?

এই কণ্ঠস্বর পরিতোষ বিশ্লেষণ করলো—প্রেম ও অশান্তিতে অতসীর অন্তর ভরে আছে, মনের এই অশান্তিটুকু কাটাতেই হবে।

পরিতোষ বল্লে—না ঘুমুইনি এখনও, এই কিছুক্ষণ শুয়েছি!

পরিতোষ চুপ করে রইল, আশা ছিল সে এখনই ঘুমুতে পারবে, ছোটখাটো দু'একটা বিষয়ে মন সংবদ্ধ করে সে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটা উড়ন্ত ছাগলের ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, ছাগল যদি উড়তো, গান্ধীজী কিসের দুধ খেতেন! বাগান-টাগান আর থাকতো না, গাছপালা সব উড়ন্ত ছাগলে খেয়ে ফেলত! অথচ বাগান না থাকলে চলে না, গৃহসজ্জার ও একটা অংশ বিশেষ,

কৌচ কেদারা চোরাবাজারে মিলবে, কিন্তু সম্পূর্ণ বাগান ত' আর কিনে এনে বসান যায় না, ব্যবিলনের বাগান আবার আকাশেই ঝুলতো, চন্দ্রনাথবাবুকে এ বিষয়ে কাল প্রশ্ন করতে হবে। বিলু মজুমদারের বাড়িটা যেন জাহাজের ডেক্, অতসী চুল বাঁধে যেন মৌমাছির চাক্, অতসী আর্শীর সামনে দাঁড়ালো, প্রাত্যহিক নৈশ রুটিন অনুযায়ী কাজ, একবিন্দু বিচ্যুতি নেই। হাত, দাঁত, চুল, হাইপোডারমিক······

বিদ্যুৎবেগে পরিতোষের মনে হোল—কিন্তু অতসী ত' আজ আর হাইপোডারমিক ব্যবহার করেনি।

পরিতোষ আবার পিছু হটলো—অতসী আর্শীর সামনে দাঁড়ালো হাত, দাঁত, চুল—জলখেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে সুইচ বন্ধ করে শুতে এল, কই হাইপোডারমিক নেয়নি ত'? কি সর্ব্বনাশ!

—অতসী, উদ্দীপ্ত কণ্ঠে পরিতোষ ডাকল—অতসী!

—কি বলছো!

—আজ ত' ইন্‌সুলিন নাওনি, হাইপোডারমিক নিতে ভুলেছ? পরিতোষ ভাবলে ভালো বিপদ, ওষুধের কথাও মনে করিয়ে দিতে হবে, চন্দ্রনাথবাবু হতে আর বাকী কি!

অন্ধকারে মৃদুকণ্ঠে অতসী বল্লে—নিয়েছি ত', হঠাৎ যে মনে পড়ল তোমার?

কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে পরিতোষ ব্যাপারটি বোঝবার চেষ্টা করল, কিছুক্ষণ পরে আলো জ্বেলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল পরিতোষ, অতসীর বিছানার পাশে গিয়ে সে বিস্ময়বিমিশ্রকণ্ঠে বল্লে—অতসী, কেন তুমি একথা বল্লে? আমি তোমাকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছি, কেন তুমি মিথ্যা বললে?

পরিতোষের বলিষ্ঠ স্পর্শের আশ্রয়ে মুখ ঢাকলো অতসী—অতসী আজ নিরাভরণ, রিক্ত। বীতবর্ষণ আকাশের মতো নিঃশেষিত অতসী চুপ করে রইল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে পরিতোষ ডাকলো – অতসী! অসহায় ভঙ্গীতে কান্নায় ভেঙে পড়ল অতসী। কি করুণ আর্ত্তনাদ!

—আমি তোমার জীবনটা নষ্ট করতে চাই না, আমি আর বাঁচতে চাই না—

মেঝেতে হাটু পেতে বসে দুটি অভয় হস্ত প্রসারিত করে অতসীর চুলে আঙুল সঞ্চারিত করে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো পরিতোষ, অতসী নীরবে দুর্ব্বল ক্ষীণ মুঠিতে পরিতোষের গলাটা জড়িয়ে ধরলো—

শান্ত হয়ে পরিতোষ বল্লে—ভুল কোরোনা অতসী, তোমাকে যে আমি ভালোবাসি একথাটা কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না।

অতসীকে বিছানা থেকে টেনে তুললো পরিতোষ, তারপর বাথরুমে গিয়ে হাইপোডারমিকের সন্ধান করতে গিয়ে কাঁচের গ্লাসটা মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল…

পরিতোষ প্রশ্ন করল—ক'দিন বন্ধ করেছ?

অতসী উত্তর দিল না। পরিতোষ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, অতসী হাইপোডারমিক পূর্ণ করলো, তারপর সজোরে তার শুভ্র বাহুতে স্থচটা ফুটিয়ে দিল। পরিতোষের কপালটি ঘেমে উঠল—তার সারাদেহে আবার সেই অলক্ষ্য শৃঙ্খলের বন্ধন অনুভূত হোল।